কথা

শ্রীযতীন সাহা

রূপ

শ্রীসমর দে

এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স্ লিঃ
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীসমর দে ও শ্রীযতীন সাহা
৫৭।১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শিল্পালয়

দোল পূর্ণিমা

১৩৪০

দাম দশ আনা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
প্রিণ্টার—প্রভাতচন্দ্র রায়
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

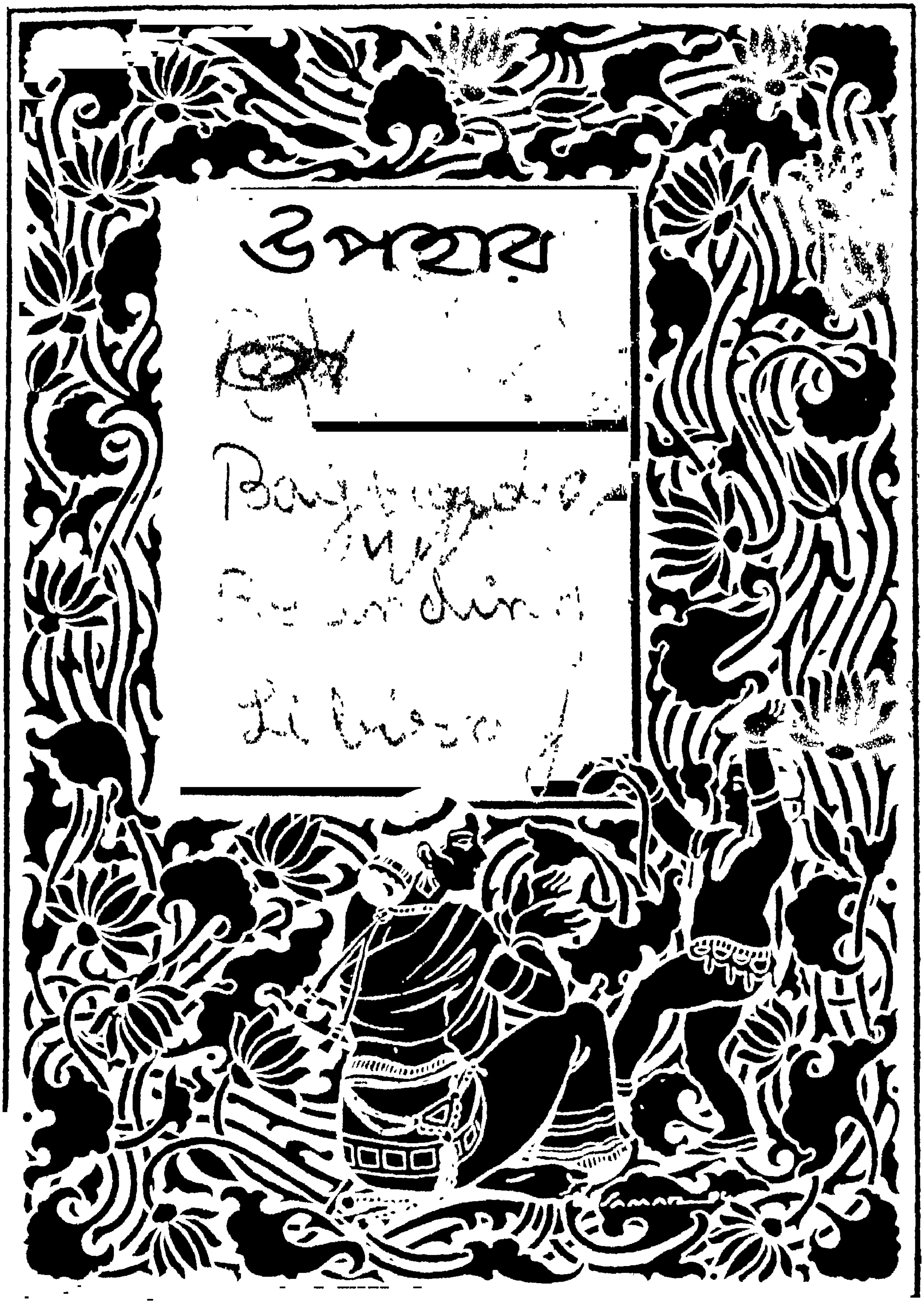
উপহার

প্রভাত	...	...	১
মা	...	...	১৯
রক্ষা কবচ	...	...	৩১
ঘরের টান	...	...	৫১
ঝমরুর অভিমান	...	...	৬৭

আজ স্পোর্টস্‌এ ফার্স্ট হয়েছি মা

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা ৪৭।:৫৫
পরিগ্রহণ সংখ্যা ২৪৯০৫
পরিগ্রহণের তারিখ ০২/৭/২০০৭

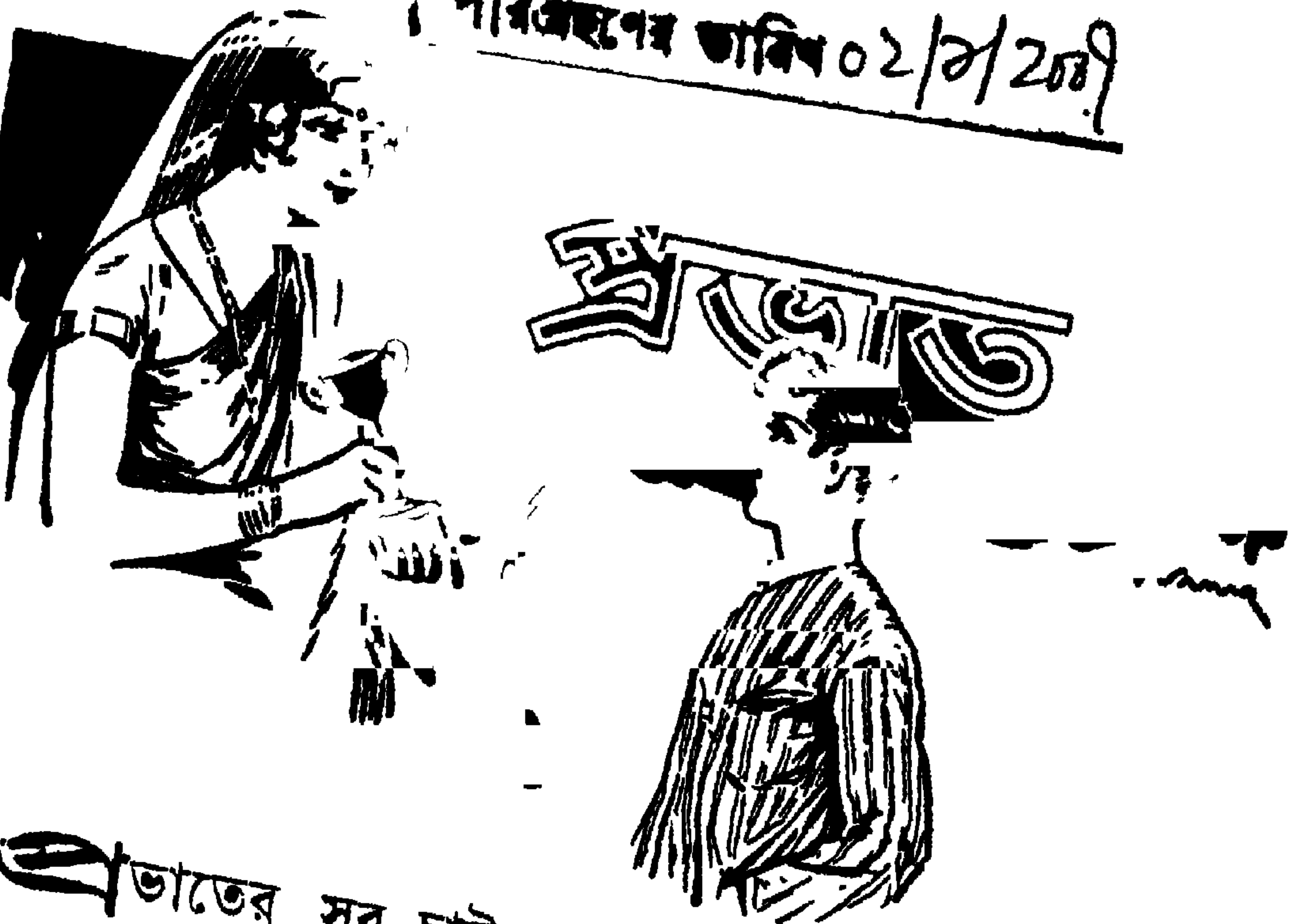

প্রভাত

প্রভাতের সব চাইতে বড় দুঃখু—ও ভারি রোগা, অসুখ ওর লেগেই আছে বারো মাস। যা'-ই খায় তা'ই ওর পেটে সয় না। ওষুধ খেয়ে খেয়ে ওর জীবনটাই হয়ে গেছে তেতো। মনে ওর স্ফূর্ত্তি নেই—মুখে ওর হাসি নেই। তবুও ওকে ওষুধ খেয়েই নাকি বেঁচে থাকতে হবে।—বাবাও তা-ই বলেন, মা-ও।

প্রভাতের সমবয়সী ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি ক'রে খেলে—লাফায়, ঝাঁপায়, দৌড়োয়, হাসে, ঘুসোঘুসি করে; আর প্রভাত তাদের থেকে দূরে গোবেচারীর মতন চুপ্‌টি ক'রে

বসে বসে ভাবে। কত কিই যে ও ভাবে, কিন্তু ভেবে আর কূল পায় না। ও কি অমনি ক'রে খেল্‌তে পায় না?

ক্লাশে প্রভাতের নাম খুব। মাষ্টারমশাইরা ওকে নিয়ে গর্ব্ব করেন। অঙ্কে পায় ও একশ'-র ভেতর একশ'; ইংরেজীতে, ইতিহাসে, ভূগোলে, সব কিছুতেই ও অসম্ভব রকম নম্বর পায়। পরীক্ষায় ও বরাবরই হয় প্রথম। দ্বিতীয় যে হয় তার সাথে প্রভাতের নম্বরের তফাৎ থাকে ঢের। প্রভাত বড় ভাল ছেলে। মাষ্টারমশাইরা বলেন, প্রভাতের মতন শান্ত শিষ্ট ছেলে কমই আছে। ও নাকি কারুর সাথে ঝগড়া করে না। —কিন্তু প্রভাত মনে মনে বলে,—চাইনে অমন ভালছেলে হ'তে।

প্রভাতের আল্‌মারী-ভর্ত্তি প্রাইজের সুন্দর সুন্দর বই। কিন্তু আল্‌মারীর দিকে চাইলে ওর চোখে জল আসে। যে বইগুলো পাবার জন্যে ওরই ক্লাশের কত ছেলে রাত দিন শুধু বই মুখস্থ করে, সেই বইগুলো যেন অম্‌নিই প্রভাতের আল্‌মারীতে এসে পৌঁছয়। তার জন্যে প্রভাতকে এতটুকু খাট্‌তে হয় না।

প্রভাত ভাবে, ইস্কুলে পরীক্ষায় প্রথম পুরস্কার না পেয়ে যদি ও 'স্পোর্টস্'এ তৃতীয় পুরস্কারটাও পেতো! যদি

অজয়ের পুরস্কারের সাথে ওর পুরস্কারের বইগুলোর বদল হ'তো! 'স্পোর্টস্'এর পুরস্কারগুলো যেন অজয়ের জন্যেই কেনা হয়!

প্রভাতদের বাড়ীর পাশে কাব্‌লীওয়ালাদের আড্ডা। প্রভাত জানালা দিয়ে তা'দের দিকে চেয়ে থাকে। ভাবে, ওদের মতন লম্বাচওড়া হ'তে পারলে কি মজাই না হ'তো! কি সুন্দর শরীরের গড়ন ওদের! প্রভাত মনে মনে বলে, এবার মর্‌লে কাব্‌লীওয়ালার মতো হয়ে জন্মাবে।

সেদিন প্রভাতদের ইস্কুলে "প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশানে"র মিটিং। প্রভাতের মা নিজহাতে জরিপাড়ের সুন্দর একখানা কাপড় কুঁচিয়ে তুলে রেখেচেন; সুন্দর একটা সিল্কের জামা সেলাই ক'রে রেখেচেন; প্রভাতকে আজ যত্ন ক'রে সেগুলো পরিয়ে দেবেন।

রেকাবিতে ক'রে সন্দেশ, মোহনভোগ আর ফুল্‌কো লুচী নিয়ে মা ঘরে এলেন। প্রভাতকে তিনি খাইয়ে, সাজিয়ে-গুজিয়ে ইস্কুলে পাঠাবেন। প্রভাতের সিল্কের জামার উপর বুকের কাছে লাল ফিতেয় বাঁধা সোনার মেডেলটা আজ কেমন চমৎকারই না দেখাবে! 'সেক্রেটারী'

মশাই স্বয়ং আজ উপহার বিতরণ করবেন। প্রভাতকে না-জানি আজ কত আশীর্ব্বাদ ক'রে তার বুকে সোনার মেডেলটি ঝুলিয়ে দেবেন! মা'র মনে আর আনন্দ ধরছিলো না। প্রভাতের ভবিষ্যৎ জীবনের কত রঙিন স্বপ্ন মা'র চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ছিলো।

মা ডাক্‌লেন—"প্রভাত!"

প্রভাত তখন বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদ্‌চে।

রেকাবিটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে মা ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন প্রভাতের কাছে। আদর ক'রে তাকে কোলে তুলে নিয়ে মা বল্‌লেন—"ছিঃ প্রভাত! লক্ষ্মীটি আমার, আজকের দিনে কি কাঁদ্‌তে আছে! কে বকেচে তোমায়?

মা'র কোলে প্রভাত এলিয়ে পড়লো। দু'গাল বেয়ে তখন ওর শুধু জল গড়িয়ে পড়চে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে প্রভাত বল্‌লে,—"কেউ কিচ্ছু বলেনি।"

মা বল্‌লেন—"তবে অসুখ করেচে?" ধরা গলায় প্রভাত বল্‌লে,—"না।"

সোহাগ ক'রে চোখ মুছিয়ে দিয়ে মা খাবারের রেকাবিটা নিয়ে এলেন।

প্রভাত বল্‌লে,—"আমি খাবো না।"

মা বল্‌লেন,—"লক্ষ্মীটি আমার, অমন ক'রো না, চট্‌ ক'রে খেয়ে নাও।"

নাক সিট্‌কিয়ে প্রভাত বল্‌লে,—"না, ওসব খেলে আমি পেট ফেঁপে ম'রে যাবো!"

প্রভাতের চোখে আবার জল এলো। চোখের সাম্‌নে ওর এত চমৎকার সব খাবার জিনিষ, কিন্তু ও তা' খেতে পারেনা। জোর ক'রে মা প্রভাতকে কিছু খাওয়ালেন; জামা কাপড় পরিয়ে ওর পায়ে নতুন 'পাম্প্‌ শু' পরিয়ে দিলেন।

প্রভাত বল্‌লে,—"আমি যাবো না মিটিংএ।"

মা প্রভাতের অভিমানের কারণ কিছুই খুঁজে পেলেন না, ভাব্‌লেন ছেলেমানুষি। আদর ক'রে তার গালে চুমু খেয়ে মা বল্‌লেন,—"সে কি মণি! আজ যে মিটিং-এ তোমায় সোনার মেডেল উপহার দেবে। প্রথম পুরস্কারের সব চাইতে সেরা বই যে আজ তোমায় আপন হাতে আন্‌তে হবে গিয়ে,

প্রভাত রাস্তায় বের হ'লো। পথে অজয়ের সাথে দেখা। অজয় দু'টো বাঁশের খুঁটী পুঁতে তা'তে দড়ি টাঙিয়ে 'হাই-জাম্প্‌' দিচ্চে। আস্‌চে সোমবারে ইস্কুলে স্পোর্টস্‌।

প্রভাত গিয়ে সেইখানে দাঁড়ালো। অজয় তখন ভয়ানক বেগে ছুটে আস্‌ছিলো, দড়িটা ডিঙিয়ে যাবার জন্যে। প্রভাতকে দেখে হঠাৎ সে থম্‌কে দাঁড়ালো।

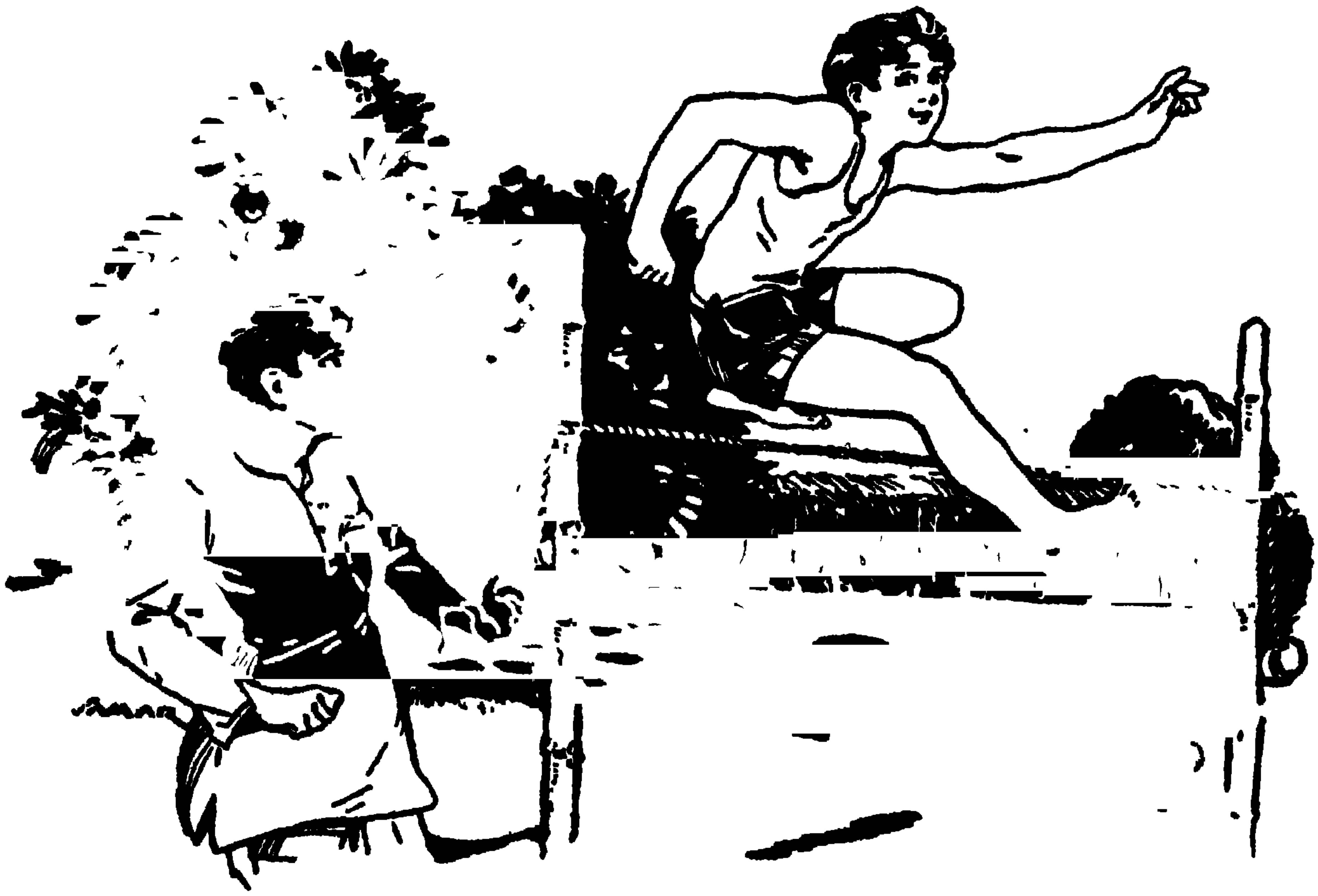

—"ইস্কুলে যাচ্ছিস্ বুঝি প্রভাত, প্রাইজ আন্‌তে ?"

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে প্রভাত বল্‌লে,—"এতো উঁচুতে লাফিয়ে যেতে পারিস্ তুই।"

হেসে অজয় বল্‌লে,—"বাঃ রে, তা' আর পারবো না।"

—"যা দিকিনি।"

—"যাবো ? —আচ্ছা।"

অজয় কয়েক পা পিছিয়ে গেলো। তারপর বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে এসে এক লাফে দড়ি পেরিয়ে গেলো।

অজয় বল্‌লে,—"লাফাবি, লাফাবি প্রভাত ?"

প্রভাতের ভারি ইচ্ছে হ'লো লাফাতে। জুতো আর সিল্কের জামা ও খুলে ফেল্‌লে। জড়িপাড়ের কাপড়টা মালকোঁচা মেরে প'রে প্রভাত বল্‌লে,—"ও বাবা, অত উপর দিয়ে যেতে পারবো না !"

দড়ি খানিকটা নামিয়ে দিয়ে অজয় বল্‌লে,—"এবার ?"

—"আরও নীচে।"

—"এখন ?"

—"আরও।"

অজয় দড়িটা খুব নীচে নামিয়ে দিলে। প্রভাত লাফিয়ে দড়ি ডিঙিয়ে গেলো। মূহূর্ত্তে ওর মনে ভারি স্ফূর্ত্তি হ'লো। শরীরটা যেন আজ ওর বেজায় হাল্‌কা হয়ে গেছে।

যে-প্রভাত সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠ্‌তে তিনবার বসে হাঁপায়, অসুখে ভুগে ভুগে আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে পাঁজরের হাড়গুলো গেছে যার বেরিয়ে, পিঠ হয়ে গেছে কুঁজো, সেই প্রভাত কিনা দিব্বি ছুটে ছুটে লাফালে !

অজয় বল্‌লে,—"ইস্কুলে যাবিনে প্রভাত ? চল্‌। তোর প্রাইজের বইগুলো আমায় দিস্ কিন্তু পড়্‌তে।"

প্রভাত বল্‌লে,—"তুই রোজ রোজ লাফাস্ অজয় ?"

ঘাড় নেড়ে অজয় বল্‌লে—"হুঁ, কত লাফাই দৌড়োই, তাছাড়া ভোরবেলা মেজদার সাথে ব্যায়াম করি। মেজদা আমাদের কত 'মেডেল' 'কাপ্‌' জিতে এনেচে দেখ্‌বি ?"

রইল পড়ে 'প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশানের' মিটিং। প্রভাত বল্‌লে,—"চল্‌!"

'পার্ক' থেকে বেরিয়ে, ছোট একটা গলি ধরে কিছুদূর গেলেই অজয়দের বাড়ী।

প্রভাতকে নিয়ে অজয় সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠেই চীৎকার করে উঠ্‌লো—"মা, ছোড়দি, শীগ্‌গির,—দেখো কে এসেচে আমাদের বাড়ী।"

ছোড়দি ছুটে এলো ; হাতের কাজ ফেলে মা-ও এলেন। —"কে রে ও রোগা ছেলেটি অজয় ?"

গর্ব্বে অজয়ের বুকটা ফুলে উঠ্‌লো ওদের ক্লাশের 'ফার্ষ্ট বয়' প্রভাত, তারই সাথে আজ হঠাৎ ওর এত ভাব হয়ে গেছে ! এমন কি, তাকে ও সাথে করে বাড়ী পর্য্যন্ত নিয়ে এসেচে। এটা কি কম কথা !

অজয় বল্‌লে,—"তাও জানো না ছোড়দি, ও যে আমাদের 'ফার্ষ্টবয়' প্রভাত !"

মা আদর করে প্রভাতকে কাছে টেনে নিলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌লেন,—"রাত দিন পড়ে' পড়ে' বুঝি অমন রোগা হয়ে গেছ প্রভাত ?"

প্রভাত মাথা নীচু করে রইলো।

মেজদার ঘরে গিয়ে প্রভাত যা দেখ্‌লে, তা'তে ও অবাক বনে' গেলো। মানুষের শরীরও আবার এত বলিষ্ঠ হ'তে পারে কখনো ! দেয়ালে দেয়ালে সব বলিষ্ঠ লোকদের ছবি টাঙানো। প্রভাত সেইদিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো।

অজয় বল্‌লে,—"জানিস্ প্রভাত, এগুলো কাদের ছবি ?"

প্রভাতের মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেলো। ও কাউকে চেনে না। কি করেই বা চিনবে ?—এক ইস্কুল আর বাড়ী ছাড়া আর কোনোদিন ও কোনো জায়গায় যায়নি। ইস্কুলের পাঠ্য বইয়ের ছবি ছাড়া কোনো বইয়ের ছবি দেখেনি কোনোদিন।—কিন্তু প্রভাত 'ফার্ষ্টবয়' !

প্রভাত বল্‌লে,—"না।"

—"জানিসনে ? সে কি রে ! এ যে স্যাণ্ডোর ছবি।

স্যাণ্ডোর নাম শুনিস্‌নি কখনো? আর এটা হচ্ছে— 'হেকেন্‌ স্মিথ্‌'এর ছবি। এ দিকে এটা কার জানিস্‌?— তাও জানিস্‌নে? আরে এযে আমাদের নাম-করা 'গোবর' পালোয়ানের, আর এটা গামার।···মেজদার ছবি দেখেছিস? এই দেখ্‌—এইটে মেজদার ছবি। কি চমৎকার 'মাস্‌ল' মেজদার, দেখেছিস্‌? আর ঐ দেখ্‌, 'গ্লাস্‌ কেসের' ভেতর মেজদার পাওয়া সব 'কাপ-মেডেল' সাজানো রয়েচে।"

অপর দিকে দেয়ালে একটা ভয়ানক রোগা সাহেব ছেলের ছবি ঝুল্‌চে। প্রভাতের একটা ছবি তুল্‌লে বোধকরি তার চাইতেও সবল দেখাবে।

প্রভাত বল্‌লে,—"এটা কার ছবি রে অজয়?" অজয় একটু হাসলে, তারপর আঙুল দিয়ে স্যাণ্ডোর ছবিটা দেখিয়ে বল্‌লে—"ঐ যে স্যাণ্ডোর ছবি দেখ্‌ছিস—এটা ওরই ছেলেবেলাকার ছবি।"

—"সত্যি!"

অজয় বল্‌লে,—"হ্যাঁ।"

একি দেখ্‌লে প্রভাত তার চোখের সাম্‌নে! ও যেন এক নতুন প্রভাত হয়ে জন্ম নিলে। তা'র বুকের ভেতর

বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠ্‌লো—নিষ্প্রভ চোখ দু'টো তার উঠ্‌লো জ্ব'লে—শরীরের রক্ত তার হয়ে উঠ্‌লো গরম। এই রোগাপট্‌কা চেহারার ছেলেটা অত বড় তাগ্‌ড়া জোয়ান হয়েচে! সে-ও মানুষ, প্রভাতও মানুষ। বাঁচতে হয় ত' মানুষ হয়েই তাকে বাঁচতে হবে। জোড়াতালি দিয়ে কোনো-মতে দুনিয়ায় টিঁকে থাক্‌তে সে চায় না—কখ্‌খনো না!

প্রভাত বল্‌লে,—"তুই রোজ ব্যায়াম করিস অজয়?"

অজয় বল্‌লে—"রোজ। একদিন পড়া না কর্‌লে মেজদা কিছু বলে না; কিন্তু ব্যায়াম না করলে—বাপ্‌ রে—তবে আর রক্ষে নেই!"

সন্ধ্যাবেলা প্রভাত বাড়ী ফির্‌লো। মা বল্‌লেন,—"কই দেখি প্রভাত কেমন মেডেল?"

বাবা বল্‌লেন,—"দেখি কি বই পেলি?"

প্রভাত বল্‌লে মিটিংএ সে যায়নি।

বাবা বল্‌লেন,—"কোথায় ছিলি তবে এতক্ষণ?"

—"অজয়দের বাড়ী।"

—"অজয়! সেই দুষ্টু বখা ছেলেটা? ওর সাথে মিশ্‌তে আরম্ভ করেছিস্‌!"

বাবা গেলেন ভয়ানক চ'টে। পিট্টি খেয়ে প্রভাত বিছানা নিলে। এত রোগা শরীরে কি আর পিট্টি সয় কখনো! ডাক্তারের উপর ডাক্তার এলো। ইন্‌জেক্‌শানের খোঁচায় প্রভাতের হাত দু'টো হ'লো অসার, অবশ। গেলাসে গেলাসে ওষুধ খেয়ে জিব্‌ হয়ে গেল ওর কালো।

কিন্তু প্রভাতকে বাঁচ্‌তে হ'বে—প্রভাত সে কথা ভোলেনি—যেম্‌নি করে বেঁচেছিলো স্যাণ্ডো। দুর্ব্বল শরীর নিয়ে রোজ ভোরে উঠে প্রভাত বুকডন্‌ করে বৈঠক দেয়। আশার আনন্দে ওর বুকে রক্ত নেচে ওঠে। ও হবে স্যাণ্ডোর চাইতেও পালোয়ান, গোবর-গামার চাইতেও বড় মল্লবীর। এঞ্জিনের মতন আগুনের জ্বালা বুকে নিয়ে ও ছুট্‌বে। সবাই ভয়ে ওকে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াবে। চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়ে প'ড়ে মর্‌তে ও ভয় পায় না কিন্তু, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিলে তিলে মর্‌তে ও কিছুতেই পার্‌বে না।

ডাক্তার পড়লো ফেল। বাবা আবার ডাকলেন বদ্যি। পুষ্টিকর ওষুধ খেয়ে নাকি ওকে মৃত্যুজয় কর্‌তে হবে!

প্রভাত রোজ ওষুধ ফেলে দেয় জানালা দিয়ে বাইরে। বাবা ভাবেন ও রোজ ওষুধ খাচ্ছে নিয়ম মাফিক।

দিন যায় আর বাবা-মা ভাবেন, ওষুধ এবার তাদের প্রভাতকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আন্‌চে। এক বোতল ওষুধ নিঃশেষ হ'লে অমনি আর এক বোতল আসে। কিন্তু প্রভাত জানে কোন্ ওষুধ ওর শরীরে কাজ কর্‌চে।

প্রভাত আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে মনে মনে ভাবে, পাঁজরের হাড়গুলো যেন ওর ঢাকা পড়্‌চে। ফিতে দিয়ে প্রভাত বুকের ছাতি মেপে দেখে। বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নিয়ে ও ভাবে এবারে স্যাণ্ডোর বুকের মত ওর বুকটাও চওড়া হয়ে চলেছে।

পালিয়ে পালিয়ে প্রভাত 'হাই-জাম্প' দেওয়া শেখে, 'লংজাম্প' দেয়। চলন্ত মোটার দেখ্‌লে দৌড়ে তার সাথে পাল্লা দেয়। মা-বাবা এর কিছুই জানেন না। যে প্রভাতের পেটে একটা সন্দেশ সইতো না, সেই প্রভাত লুকিয়ে লুকিয়ে মুঠো মুঠো আদা-ছোলা খায়।

ঝিকিমিকি

সেদিন বাবা-মা বাড়ীতে নেই। সুযোগ পেয়ে প্রভাত গেলো অজয়দের বাড়ী। প্রভাত দেখলে, অজয়ের মেজদা আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে ডাম্বেল ভাঁজচে। কি চমৎকার তার দেহের গড়ন! অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রভাত দেখ্‌লে। তা'র শিরায় শিরায় যেন রক্ত নেচে উঠ্‌লো।

প্রভাতের যে কয়েকটা টাকা ছিল, তাই দিয়ে ও সেই দিনই 'কার-নবিশের' দোকান থেকে এক জোড়া 'স্প্রিং' ডাম্বেল কিনে নিয়ে এলো। পাছে ধরা প'ড়ে বাবার কাছে বকুনি খেতে হয়, তাই লুকিয়ে লুকিয়ে ও ছু'বেলা ডাম্বেল ভাজে।

একবছর পর আবার ইস্কুলে 'প্রাইজ-ডিষ্ট্রিবিউশান'-মিটিং। হাস্‌তে হাস্‌তে প্রভাত সোনার মেডেল বুকে ছুলিয়ে বাড়ী এলো।

সাতদিন পর 'স্পোর্টস্' হ'লো। প্রভাত হ'লো ফার্ষ্ট, আর অজয় হ'লো সেকেণ্ড।

অজয়ের সাথে গলাগলি ক'রে প্রভাত পুরস্কার নিলে রূপোর 'কাপ্'।

প্রভাত

বাড়ী এসে প্রভাত মাকে প্রণাম কর্‌লে। 'কাপ্‌' টা মার হাতে দিয়ে হেসে বল্‌লে—"আজ ইস্কুলের স্পোর্টস্‌—ফার্ষ্ট হয়েছি মা !"

মা প্রভাতের দিকে চেয়ে থাকেন, দেখেন সেদিনের মতন ওর চোখে আজ আর জল নেই—সমুদ্রের মতো গভীর নীলাভ ওর চোখ, সুস্থসুঠাম দেহ। রোগের হাত থেকে আজ ও ছাড়া পেয়েচে। মেঘের পর সোনার রৌদ্রভরা স্বচ্ছ নীল আকাশের মতো নির্ম্মল হাসিতে ওর মুখচোখ ভরে গেছে। এত স্বাস্থ্য, এত কান্তি প্রভাতকে কে দিলে !

প্রভাতের বাবা একদিন প্রভাতের মার কাছে কবিরাজ মশাইয়ের ওষুধের তারিফ কর্‌ছিলেন, প্রভাত শুন্‌তে পেয়ে বল্‌লে,—"কবিরাজ মশাই-এর ওষুধ তো ভালই, কিন্তু বাবা, ব্যায়ামটা তাঁর চাইতেও ভাল। তাই ওষুধ আমি একটুও খাইনি—সব ঢেলে ঢেলে ফেলে দিয়েচি।

বাবার চোখের সুমুখ থেকে যেন একটা কুয়াসার পর্দ্দা স'রে গেল।

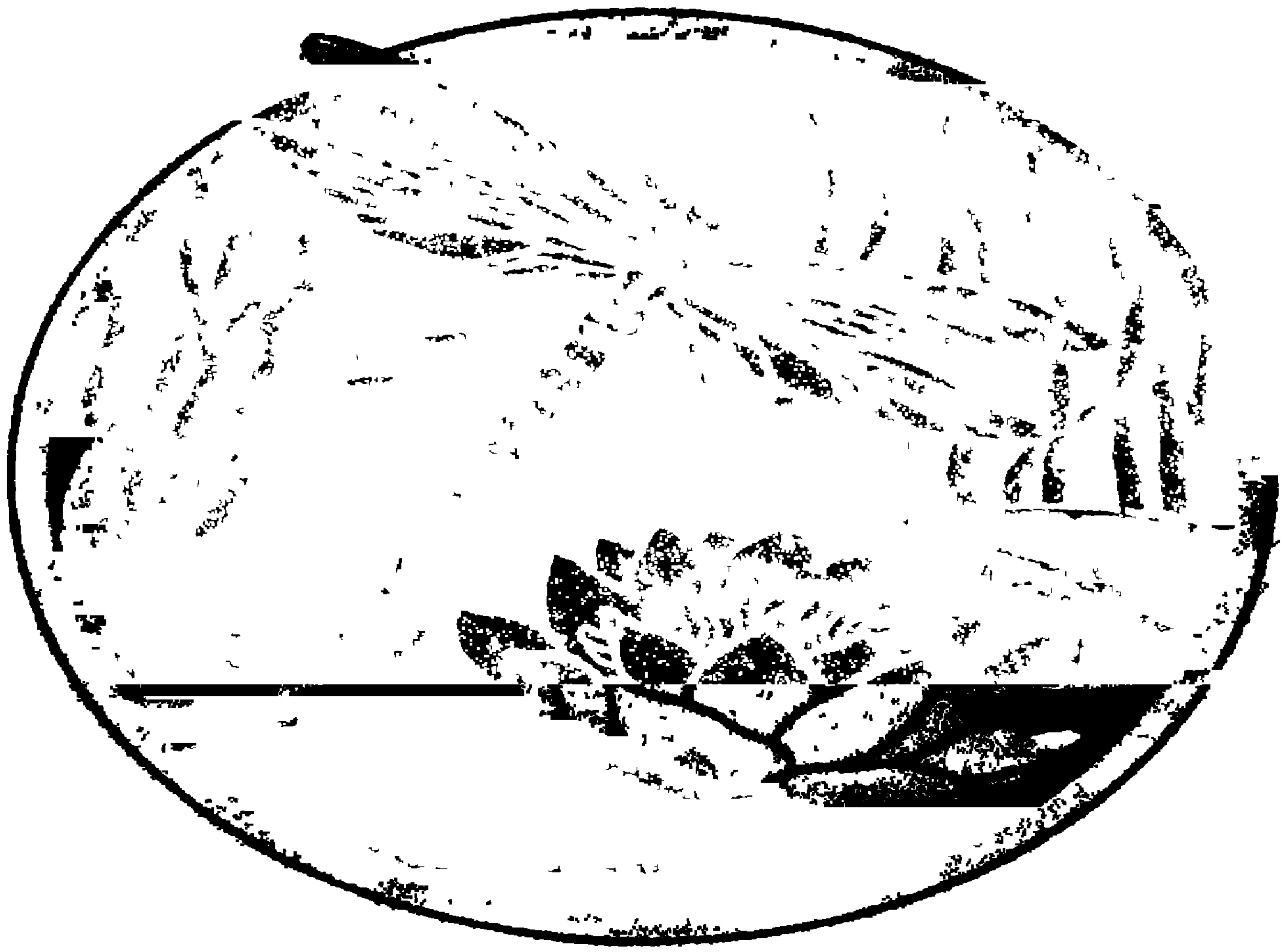

আ

মা

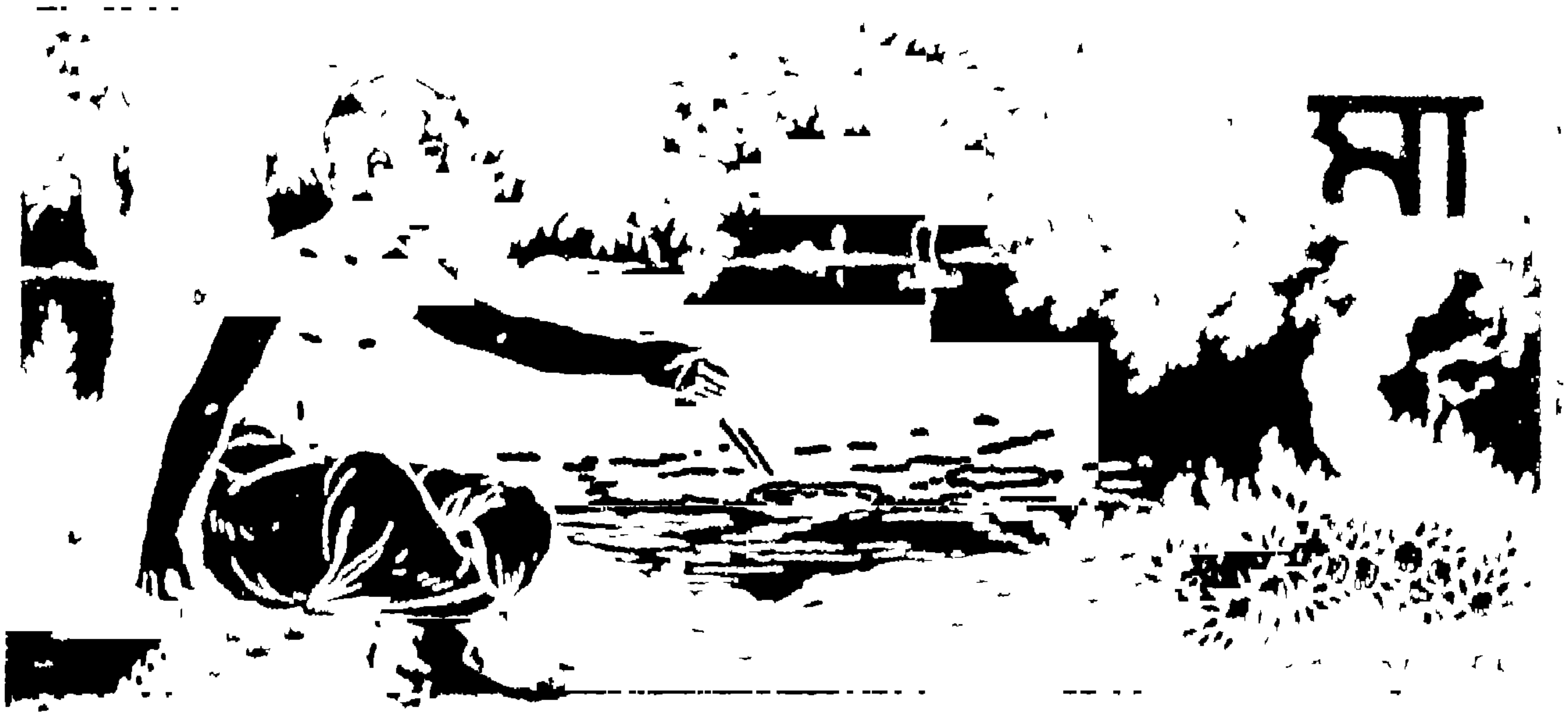

ভেলুর মা নেই ;—মাকে ভাল ক'রে বোঝ্‌বার আগেই মা'র ডাক পড়েছিলো কোন্‌ সুদূরের ওপার থেকে।

ও মাঝে মাঝে ওর মা'র অভাব বুঝ্‌তে পারে। ওর খেলার সাথীদের সবারই মা আছে, তবে ওর মা কোথায় গেল ? ওর মনে সেই প্রশ্নটাই বার বার ওঠে—ও ছুটে গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করে ; কিন্তু জবাব পায় না।

ওর বাবা ওকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে, শুধু জানালাটা দিয়ে আকাশের পানে পাগলের মত বেহুঁস হ'য়ে চেয়ে থাকে। ও আবার জিজ্ঞেস করলে ওর বাবা চমকে ওঠে—কি কইতে চায়, কিন্তু গলা দিয়ে তার কথা বেরোয় না।

ঝিকমিক

সেদিন ভেলুর ছোড়্দি এসেছে পেশোয়ার থেকে, ওর জ্ঞান হবার পর এই প্রথম।

এই সেই ছোড়্দি, যে ওর জন্যে কত বাদাম, কত কিস্‌মিস্, কত আঙুরই না পাঠিয়ে দিতো। এই ছোড়্দির কথাই না ও ওর সহপাঠিদের কাছে কত গল্প করেছে; কত-দিন কত নতুন ক'রে ভেবেছে; কত রঙিন্ হয়েই না ওর অচেনা অজানা ছোড়দির ভালবাসাটুকু পাহাড় ডিঙিয়ে, নদী পার হয়ে এসে ওর ছোট্ট মনের রাজ্যে বাসা বেঁধেছে! —আজ সেই কত আদরের ছোড়্দি এসেছে; আর ও কিনা মনমরা হ'য়ে গাল ফুলিয়ে অভিমান ক'রে ঘরের এক কোণে চুপটি ক'রে বসে রয়েছে!

ভেলুর এত অভিমান কিসের জন্যে?

ছোড়্দি খুঁজে খুঁজে হয়রান। "ভেলু! ভেলু! ও ভেলু! কোথায় গেলি?"—কত যে ডাকাডাকি তবুও ওর সাড়া নেই।

তারপর ওর ছোড়্দি যখন কানামাছি খেলার চোরের মতন ওকে ধ'রে ফেল্‌লো, ও হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে কিনা —"যাও, তুমি ভারি দুষ্টু! কেবল এতদিন আমায় চিঠিতে ফাঁকি দিয়েচো।"

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা ২৪৮০৫
পরিগ্রহণ সংখ্যা
পরিগ্রহণের তারিখ 02/2/2007

ছোড়্‌দি আদর ক'রে ভেলুর কোঁকড়া চুলগুলোতে হাত বুলিয়ে গালে চুমু খেয়ে বলে—"লক্ষ্মী আমার! তোর জন্যে কত খাবার, খেল্‌না, কত গল্পের বই এনেছি দেখ্‌বি আয়।"

ও সে কথায় ভোলে না, বলে—"ও আমি চাই না—আগে বল মা-মণি কোথায় গেছে?"

ছোড়্‌দির ডাগর ডাগর চোখছুটো ছল্‌ ছল্‌ করে ওঠে, লুকিয়ে চোখ মুছে ফেলে বলে—"মা-মণি গেছে তীর্থে; তা তুই জানিস্‌ না বুঝি? মা কি আর তোকে ফেলে থাক্‌তে পারে? তীর্থ শেষ হ'লেই ফিরে আসবে।"

ভেলু বলে—"না, মা-মণিকে তুমি চিঠি লিখে দাও, আজই চলে আসুক্‌—নয়তো ঠিকানা বলে দাও, আমি নিজেই চিঠি লিখে দি। হ'লই বা আমার হাতের লেখা খারাপ, তা' বলে কি মা-মণিকে চিঠি দেবোনা?"

ছোড়্‌দি বলে—"আচ্ছা আমি কালই তার করে দেবো; না আসে তো আমি নিজেই গিয়ে নিয়ে আস্‌বো, চল্‌ তোর সব জিনিষ নিবি।"

মাস ছুই থেকে, ছোড়্‌দি একদিন চলে গেল। ভেলু ঘুম থেকে উঠে ওর দিদিকে খোঁজে। ছাদে, উঠোনে,

রান্নাঘরে, আনাচে-কানাচে, কোথাও ওর ছোড়্‌দি নেই—শুধু শূন্য ঘরগুলো খাঁ খাঁ করে যেন ওকে গিল্‌তে আসে।

ও ওর ধাই-মাকে জিজ্ঞেস করে। ধাই মা বলে, "দিদিমণি চলে গেছে পেশোয়ারে।" মন ভার ক'রে ও বসে থাকে—ভাবে, এমন বাড়ীতেও আবার মানুষ থাকে? মা গেছে তীর্থে, দিদি গেছে পেশোয়ারে তো ও থাক্‌বে কা'কে নিয়ে!

ওর আর দিন কাট্‌তে চায় না। সময়-মত নাওয়া নেই খাওয়া নেই, ও শুধু বসে বসে কি যেন ভাবে। পড়্‌তে বসে আনমনা হয়ে বইয়ের পাতা হারিয়ে ফেলে। সবার সাথে ও খেলাধূলো করতে যায়; কিন্তু সব কিছুতেই ওর যে কি একটা অভাব, ও তা বুঝতে পারে না। ঘুমোতে গিয়ে সব বাজে স্বপ্ন দেখে ওর ঘুম ভেঙ্গে যায় মাঝ রাতে।

ভেলুর বাবা ওকে সব সময় চোখে চোখে রাখে; কত আদর কত যত্ন করে, তবুও ওর মুখে হাসি নেই।

সেদিন ওর বাবা ওকে নিয়ে ওদের গাঁয়ের নীচে—ছোট্ট নদী শীতলার ধারে—বেড়াতে গেছে। ও চেয়ে দেখে, ঢেউগুলো যেন হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকছে না? আকাশের পানে চেয়ে দেখে, আকাশের মনে সুখ নেই—গাছের দিকে

চেয়ে দেখে দিনের শেষে পাখীরা সব ফিরে এসেচে, কিন্তু আজ তাদের মুখে মিষ্টি কলরব নেই—সূর্য্যের পানে চেয়ে দেখে বিদায় ব্যথায় তার মুখ রাঙা হয়ে ওঠেনি—কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আজ ওর হ'ল কি? এই যে চারি-দিকে ওর সব মূক বন্ধুরা, ওরা অমন করে আজ ওকে ভেংচি কাটচে কিসের জন্মে?

ওর জীবনে ও কি একটু প্রাণ খুলে হাস্‌তেও পাবে না?—নাইবা পেলো হাস্‌তে, কিন্তু তাই বলে কি ও একটু কাঁদ্‌তেও পাবে না?—যেখানে হাসি নেই, কান্না নেই, সেখানে ও বাঁচ্‌বে কি ক'রে? ওকে কি কেউ একটু কাঁদতেও শেখায়নি? তবে আর ঘড়ির মত মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে দম দিয়ে বুকের ভেতর ধুক্ ধুক্ করে যন্ত্র চালিয়ে লাভ কি?

ওর মা-যে তীর্থে গেছে, সে যদি ঐ দূরের ছোট্ট পালতোলা নৌকো ক'রে ফিরেই আসে তো ও আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাস্‌বে কেমন ক'রে?—তা কি ও পার্‌বে?

ভেলু ওর বাবার মুখের পানে তাকায়—মনে হয় ওর বাবার চোখত্নটো যেন সেই নদীর ধারে কাকে খুঁজে বেড়ায়।

ফেরার পথে ওর বাবা ওকে একটা বকুলগাছ দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লে—"নমস্কার কর ভেলু—এই যে এইখানে, এই

বকুলতলার ঘাটে আজও তোর মায়ের পায়ের ধূলো মাটিতে মিশে রয়েচে। তোর ছোড়্‌দি বল্‌ছিলো না যে তোর মা-মণি তীর্থে গেছে?—সে এই ঘাট থেকেই নৌকোতে শীত্‌লা পাড়ি দিয়েছে—নমস্কার কর।"

ভেলু ওর বাবার বুকের মধ্যে মিশে গিয়ে বলে—"হ্যাঁ বাবা, সত্যি?—তা তুমি এতদিন আমায় বলোনি কেন? আমি যে এখানে রোজ সকালে বকুলফুল কুড়োতে আসি।"

ভেলু সেইখানকার ধূলো ওর কপালে ছুঁইয়ে বলে, "কিন্তু মা-মণি ফিরে আস্‌বে কবে বাবা?—মা-মণি কি আমাদের ভুলে গেছে?"

ভেলুর বাবার দুচোখ জলে ঝাপ্‌সা হয়ে আসে, ওকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদে।

ভেলুর মা ভেলুকে ভুলে গেছে বলে ভেলু কি তার মা-মণিকে ভুল্‌তে পারে?—ওর শিরায় শিরায় যে মায়ের রক্তেরই ঢেউ বইচে।

ও রোজ বিকেলে এসে সেই বকুলতলায় বসে থাকে। মালা গেঁথে ওর মার উদ্দেশে জলে ভাসিয়ে দেয়। ও বসে বসে শুধুই ভাবে এম্‌নি একদিন সন্ধ্যায় হয়তো ওর মা-মণি আস্‌বে। সেই দিনটির আশায় আশায় ওর দিন কেটে চলে।

মা

সেদিন বিজয়াদশমী—সবাই ঘরে ফিরে মা বাবাকে প্রণাম করবে ; কিন্তু ভেলু আজ প্রণাম করবে কাকে ?—কে আজ ওকে লক্ষ্মীটি ব'লে বুকে তুলে নেবে ?

আজকে মায়ের অভাবটা ও সারা বুক দিয়ে অনুভব করলে—মার কথা মনে পড়তেই ও ছুটলো সেই বকুলতলার ঘাটে। আজ এমন দিনেও যদি ওর মা ফিরে না আসে তো সে আর মা কিসের ?

নদীর বুকে ছোট্ট ঢেউগুলোর দোলার তালে তালে পাল তুলে নাচতে নাচতে নৌকো চলে, ভেলু ভাবে ঐ বুঝি তার মা-মণি আস্‌চে। আশায় বুক বেঁধে ও নৌকোর দিকে চেয়ে থাকে—নৌকো পাড়ে ভেড়ে না, জল ঘুলিয়ে ফেনিয়ে মাঝ-দরিয়া দিয়ে চলে যায়।

চেয়ে চেয়ে সন্ধ্যা হ'ল—সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হ'ল, তবুও ওর মা এলো না।

মায়ের উপর অভিমান ক'রে ও ফিরে চল্‌লো একলা পথে। চল্‌তে চল্‌তে ওর কেমন ভয় ভয় ঠেক্‌লো। একটু যেতেই ওর কানে এলো ঠিক বাঁশীর সুরের মতোই করুণ একটা কান্নার রেশ।

—এমন দিনেও আবার মানুষে কাঁদে !

ভেলু স্পষ্ট শুনলো মেয়েলী সুরে কে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদ্‌চে—সে কী বুক-ফাটা কান্না!—"রাজু! রাজু! তুই আমায় ফেলে কোথায় গেলি বাবা?"

ভেলুর বুকটা দুর্ দুর্ করে কেঁপে উঠ্‌লো—তবে কি রাজু নেই?—রাজুকে যে ও কত ভালবাস্‌তো, সেই রাজু নেই, সে কি হয়?—তবে ও খেলবে কার সাথে? ভাব্‌তেই ওর দু'-চোখ ছাপিয়ে জল এলো। ও ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠ্‌লো!

ভেলুর কান্নায় বুঝি রাজুর মা'র চমক ভাঙ্‌লো। ছুটে গিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লো — "ষাট আমার দুঃখিনীর বুকজোড়া ধন, তোকে বুকে তুলে দেবার জন্যেই কি রাজু আজ হাস্‌তে হাস্‌তে বিদায় নিয়েচে? — দুঃখ কিসের বাবা!"

চোখের জলের ঝাপ্‌সা পর্দ্দা ভেদ করে ভেলু তার মায়ের মুখখানা পরিষ্কার দেখতে পেলো না, কিন্তু সমস্ত শরীর দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে আজ যেন ও মায়ের অপূর্ব্ব ভালবাসা অনুভব করলে; এমন মিষ্টি ক'রে তো কেউ ওকে আর কোনদিন ভালবাসে নি; ওর ছোড়্‌দিও না—বাবা-ও না।

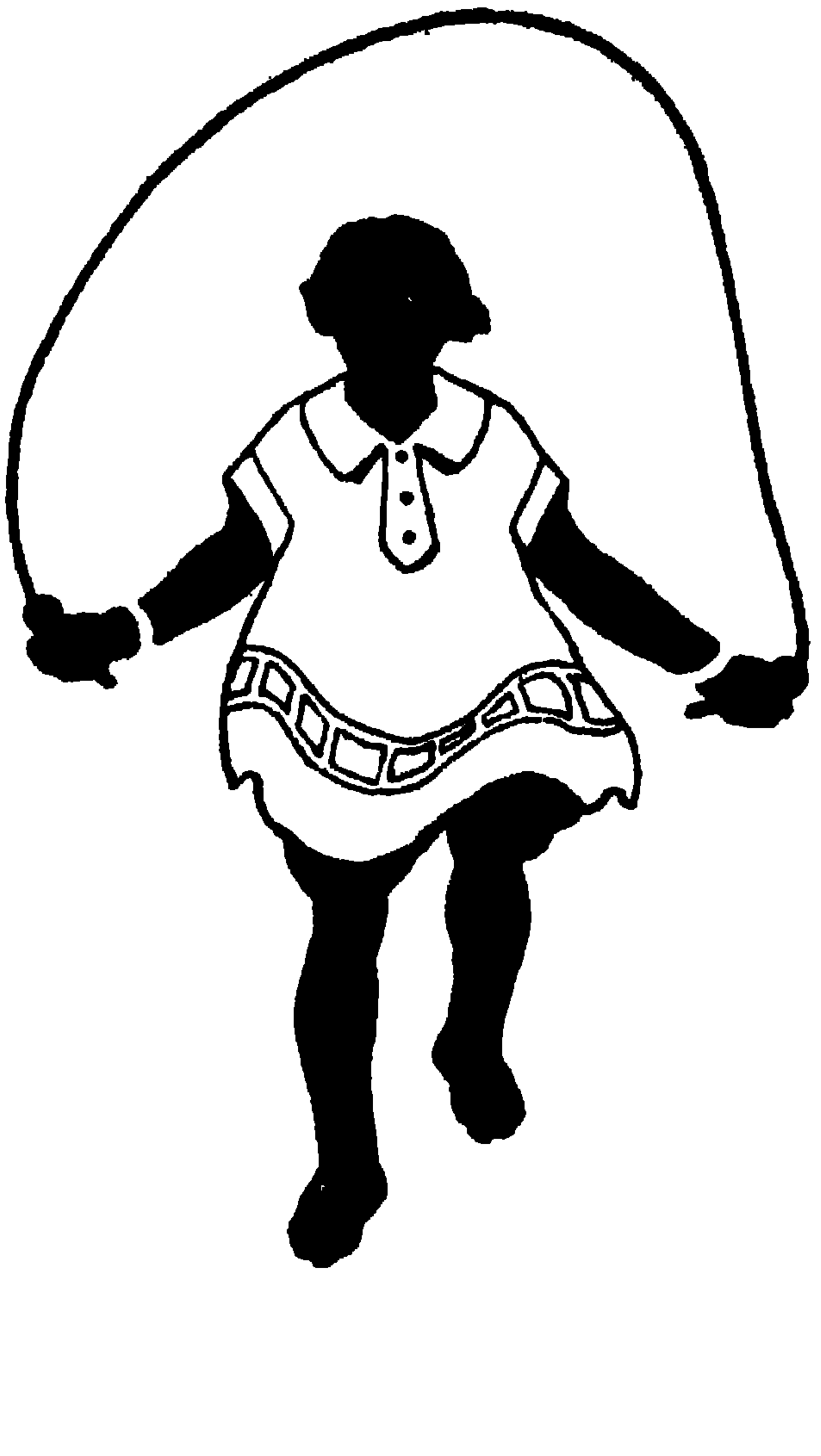

রক্ষা কবচ

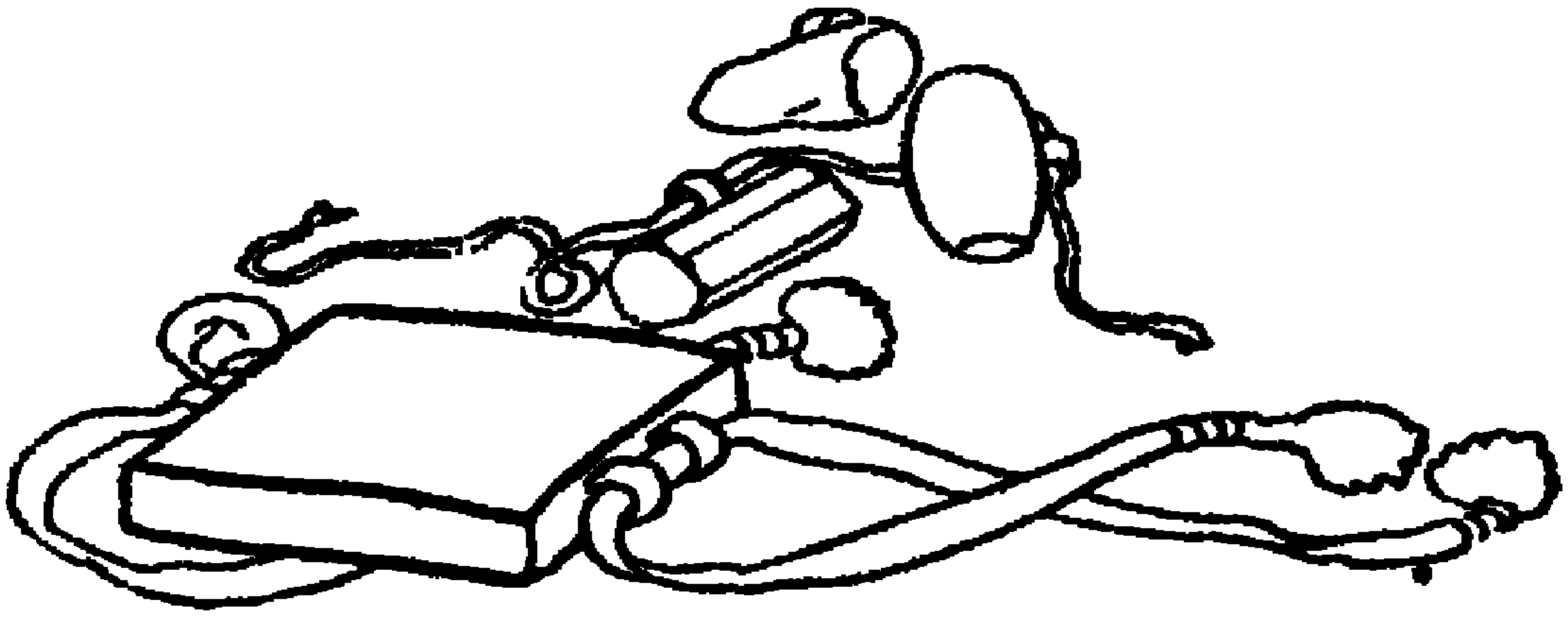

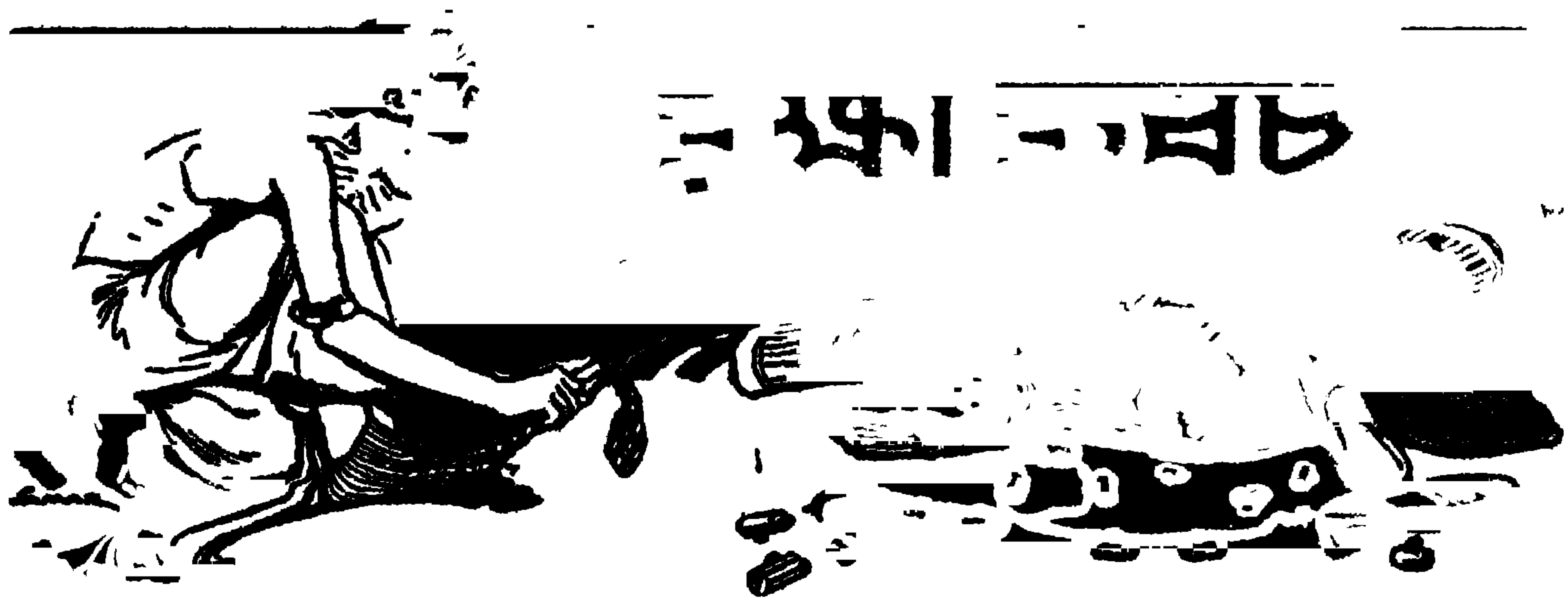

সমর যেদিন প্রথম চোখ মেলে চাইলো, সেদিন আকাশের মনে তেমন স্ফূর্ত্তি ছিল না মোটেই—মন-মরা হয়ে, গাল ফুলিয়ে, আকাশ শুধুই গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদছিলো।

পথ ঘাট ভিজে, স্যাঁতসেঁতে গন্ধে বাতাস উঠেছিলো ভ'রে। সেই যে এঁদো পচা দিনে সমর প্রথম চোখ মেলে চাইলো, ও আর আলোর মুখ দেখ্‌লো না। সর্দ্দি আর জ্বর, কফ্‌ আর 'ব্রঙ্কাইটিসে' বুকের পাঁজরগুলো ওর উঠল ফুটে। ওষুধ আর মালিশ, 'ফ্লানেল' আর সেক্‌ লিখে দিল বিধিলিপি ওর কপালে।

সোণার হারের পরিবর্ত্তে সমুর গলায় ঝুল্‌লো রক্ষাকবচের মালা। কড্‌লিভার অয়েল আর সিরাপ বাকস্‌ খেয়ে

খেয়ে ওর কণ্ঠ হয়ে উঠ্‌লো নীল, জিব হয়ে গেল কাল্‌চে।

পায়ে উলের মোজা, গায়ে পুরু গরম জামা, মাথায় গরম টুপী, বর্ম্মের মতন অষ্টপ্রহর রাখ্‌লো ওকে ঘিরে —উলের বর্ম্ম প'রে ওকে সারাজীবন ধ'রে কফ্‌ আর সর্দ্দির সাথে নাকি লড়্‌তে হবে।

একটা টিক্‌টিকি বল্‌লেও খুব অন্যায় বলা হয় না। সেই সমু একদিন অনেক কষ্টে মাটির উপর দাঁড়ালো। জানালার ফাঁক দিয়ে সমু রাস্তার পানে চেয়ে থাকে। বসে বসে ওর আর কাজ নেই। দিনের পর দিন ঐ জানালাটুকু লক্ষ্য করেই ও বড় হয়ে চলেচে। ঐটুকু যেন ওর শক্তি, ঐটুকুই যেন ওর প্রাণ।

জানালা খুলে দিলে ওর চোখের পাতা খোলে, জানালা বন্ধ করে দিলে আপনিই আবার ওর চোখের পাতা বুঁজে আসে। জানালা দিয়ে যতটুকু আকাশ, যতটুকু পথ, যতটুকু জায়গা দেখা যায়, সেইটুকুই ওর স্বপন-রাজ্য। তার বাইরে যে আর কিছু আছে, তা ও জানেও না, ভাব্‌তেও পারে না।

জানালায় দাঁড়িয়ে আপনমনে সমু রাস্তার লোকের সাথে বন্ধুত্ব পাতায়, হাত গলিয়ে ও তাদের ধরতে চায়।

কিন্তু সার্সি-আঁটা জানালার বাইরে ওর হাত গলিয়ে দেবার হুকুম নেই, শক্তিও নেই। একটু যদি বাতাস বয়, একটু যদি ঠাণ্ডা লাগে, মার কড়া হুকুমে তাই জানালার সার্সি স্ক্রুপ দিয়ে আঁটা।

গলায়, হাতে, কোমরে, সমস্ত দেহ জুড়ে ওর ছোটখাটো একটা মাতুলীর প্রদর্শনী। দিনের পর দিন সংখ্যায় সেগুলো বাড়্‌চে বই কম্‌চে না। সোণা, রূপো, পেতল, তামা, দস্তা, কাঁসা, কোন ধাতুই বাদ যায় নি। জোঁকের মতন তারা যেন ওর গা থেকে রক্ত চুষে খাচ্চে।

মাতুলীর ভারে ওর মেরুদণ্ড গেছে বেঁকে। রোগে ভুগে ভুগে ও হয়ে গেছে একটা জোঁকের মতন লিক্‌লিকে।

অতি কষ্টে দু'হাতে জানালার দুটো শিক ধরে সমু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার দৃশ্য দেখে। রাস্তা দিয়ে কোন্ দিন ক'টা ফিরিওয়ালা যায় ওর তা মুখস্থ হয়ে গেছে। পাড়ার ছেলেরা এসে তাদের কাছ থেকে চানাচুর, লজেঞ্চুস কত কি কিনে খায়—সমু শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে। একটা পয়সা দিয়ে ওর এক পয়সার লজেঞ্চুস কিনে খাবার উপায় নেই। দোতলার অতটুকু ঘরটাতে ও বন্দী।

—"মা, এক পয়সার চানাচুর খিনে খাই?" অমনি

মা চোখ রাঙিয়ে বলেন, "সর্ব্বনাশ, ও খেলে পেট কেঁপে মরে যাবি যে রে!"

—"মা জানালাটা একটু খুলি?" মা অম্‌নি দু'চোখ কপালে তুলে বলেন, "ওরে বাবা! ঠাণ্ডা লাগ্‌বে যে!"

—"মাদুলীটা একটু তুলে নেও মা, গলায় বড্ড লাগ্‌চে।"

ধমক্ দিয়ে মা বলেন, "না না, জ্বর আস্‌বে!"

যা-কিছুই ও করতে যাবে তাতেই মানা। ওর জ্ঞান হবার পর থেকে 'আচ্ছা' কথাটা ও কোনো দিন শুনেচে ব'লে ওর মনে পড়ে না। শুধু একটা 'না' শোনবার জন্মেই যেন সমুর জন্ম হয়েচে।

রোজ গাড়ী ক'রে সমরকে ইস্কুলে নিয়ে যায় বাড়ীর কোচম্যান; ছুটির পর আবার ঠিক তেম্‌নি বাড়ী নিয়ে আসে। বাবার হুকুম, ও যেন কোথাও ছুটোছুটি কর্‌তে না পারে। শরীরের একটা শিরায় যদি একটু আঘাত পায় তবে যে আর ওকে বাঁচানো যাবে না।

ইস্কুলে যাওয়া আর আসা এইটুকু সময় সমুর যেন কত কাম্য। সারাদিনে কখন সেই সময়টুকু আস্‌বে তারই প্রতীক্ষায় ও ঘড়ির কাঁটা ধ'রে বসে বসে সময় গুনে চলে। স্কুল ফেরা পথে ওদের গাড়ীটা যে পার্কের ধার দিয়ে ঘুরে

আসে ওর কেবলই ইচ্ছে হয় একটিবার সেখানে নেমে পড়ে, বাগানের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সাথে ছুটোছুটি ক'রে একটু খেলে নেয়। কিন্তু সে কথা ভাব্‌তেও ওর বুক্‌টা কেঁপে ওঠে। দুর্ব্বল শরীর, মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুর্‌তে সুরু ক'রে দেয়। চোখ বুঁজে সমু গাড়ীর গদির উপর শুয়ে পড়ে। এত দুর্ব্বল এত রোগা ও!

কিন্তু এম্‌নি করে কয়েদ খেটে মানুষ ক'দিনই বা বাঁচতে পারে! সমুর মনের প্রবল ইচ্ছাই যেন ওকে দিন দিন একটু একটু করে শক্তি দিলো। সাহস ক'রে ও সেদিন মোড় ঘুর্‌তেই গাড়ী থেকে পার্কের ধারে নেমে পড়্‌লো।

পার্কে যাওয়া ওর আর হ'ল না। কোচোয়ানের উগ্রমূর্ত্তি আর চোখ রাঙ্গানি ওর শত ইচ্ছাকে ঐ খানেই নির্ম্মূল করে দিলো।

খেল্‌তে ও পার্‌লো না—কোন্ দিনই: বা ও খেল্‌তে পেয়েচে, কড়া শাসনের হাত থেকে কোন্ দিনই বা একটি মুহূর্ত্তের জন্যে ছাড়া পেয়েচে! তাতেও ওর দুঃখ নেই; কিন্তু একটা কোচোয়ানের হুকুম পর্য্যন্ত ওকে তামিল করতে হবে এত বড় অপমান সমু সইতে পারলে না। গাড়ীর ভেতর বসে ও শুধু অভিমানে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

বাড়ী এসে সমর মুখ ভার করে জানালা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। এত বড় অপমানের জন্যে সামান্য একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত কর্‌তে পার্‌লে না।

মুহূর্ত্তে রাস্তার জনস্রোতের মধ্যে ও নিজেকে ফেল্‌লে হারিয়ে। তন্ময় হয়ে ও রাস্তার দৃশ্য দেখ্‌তে লাগ্‌লো। এ দুনিয়ায় ওর সব চাইতে বড় বন্ধু ঐ রাস্তাটুকু। এইটুকুকেও যদি ওর চোখের আড়াল করা যায় তবে শত মাদুলী, শত রক্ষাকবচের ক্ষমতাও নেই যে ওকে বাঁচিয়ে রাখে।

বাস্, ট্রাম, মোটর, গাড়ী ঘোড়া, সবাই যেন আজ ওকে ব্যঙ্গ ক'রে ছুটে পালাচ্চে। দুনিয়ার সবাই মুক্ত, ঐ কি শুধু বন্দী? রাস্তার হাজার হাজার লোকের সাথে তালে তালে পা ফেলে কি ও চল্‌তে পারে না? আজ যদি ওর গায়ে শক্তি থাক্‌তো তো ঘুসি পাকিয়ে ও গাড়োয়ানের কথায় জবাব দিতো, দু'হাতে মুচ্‌ড়ে জানালার শিক ভেঙ্গে লাফিয়ে ও রাস্তার জনস্রোতের সাথে মিশে যেতো।

চঞ্চল হয়ে সমু জানালার শিক ধরে রাস্তার দিকে ঝুঁকে পড়্‌লো। দূরে কি একটা হল্লার শব্দ ওর দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌লো। সমর দেখ্‌লো হৈ-হল্লা করে একদল চীনা আস্‌ছে :

রাস্তার ধারে ঐ জায়গাটুকু একটু ফাঁকা পেয়ে তারা তাদের পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি নামালো।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেখানে লোক জুটে গেল ঢের। বাজ্‌না বাজিয়ে চীনারা খেলা সুরু ক'রে দিলে। ছোট্ট বেঁটে

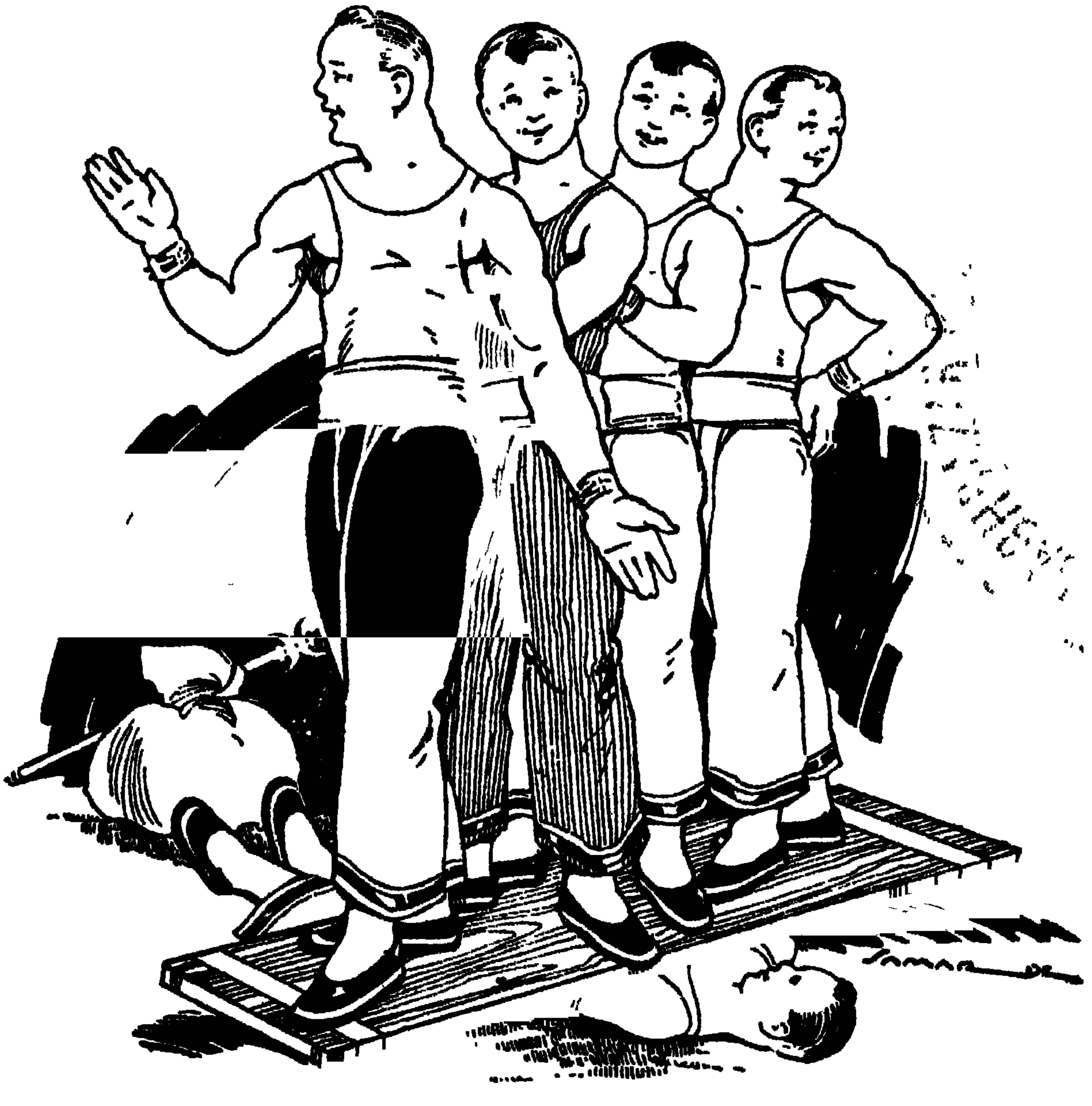

একটা চীনে ছোঁড়া চীৎ হয়ে শুয়ে,তার বুকের ওপর একটা

তক্তা দিয়ে, অবাধে পাশাপাশি চারটে তাগ্ড়া জোয়ান চীনেকে দাঁড় করিয়ে রাখলে; মোটা লোহার শিক নিয়ে মুচ্ড়িয়ে সেটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেল্‌ল। পাঁচটা লোকে যে লোহার বলটাকে টেনে নাড়্‌তে পার্‌লো না, সেটাকে অনায়াসে তুলে ছুড়ে ফেলে দিলে চার হাত দূরে। শরীরের মাংস-পেশীর সঞ্চালনা দেখিয়ে সে সবাইকে ক'রে দিলে অবাক্। এতটুকু ছেলের এত শক্তি! সমু যা কোনোদিন ভাব্‌তেও পারে নি, আজ চোখের সামনে তাই দেখ্‌লে। বিস্ময়ে ওর চোখ দুটো গিয়ে কপালে উঠ্‌লো।

দিনের উজ্জ্বল আলোকে চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট আজ সমর এ কি দেখ্‌লে—স্বপ্ন না সত্যি? সমুর পা থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত সমস্ত রোমকূপে যেন কিসের শিহরণ জেগে উঠ্‌লো। জোঁকের মতন ঠাণ্ডা শরীর ওর উত্তেজনায় হয়ে উঠ্‌লো গরম। এক টানে সমু গায়ের উলের বর্ম্ম ফেল্‌লে ছিঁড়ে, টেনে হিঁচ্‌কে ওর মোজা ফেললে খুলে, মাদুলীর বোঝা ছুড়ে ফেলে দিলে সাত হাত দূরে। ও-ও আজ দুনিয়ায় বাঁচ্‌তে চায়—যেম্‌নি করে বেঁচে আছে ঐ চীনে ছোঁড়াটা। শুধু-গায়ে সমু গিয়ে দেয়ালের আরসিটার কাছে দাঁড়ালো। জ্ঞান হবার পর এই ও প্রথম

ওর সমস্ত শরীরের প্রতিচ্ছবি দেখ্‌লে আর্‌সিতে। ওর শরীরও শরীর, আর সেই চীনে বাচ্চার শরীরও শরীর!

ব্যায়াম ক'রে সমু স্বাস্থ্যবান্ হবে, বুক ভ'রে নিশ্বাস নিয়ে ও বাঁচ্‌বে! এই যে বাঁচ্‌বার এত বড় একটা ওষুধ সে ওষুধ কিনা আজ ও নিজেই আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌লে! আমেরিকা আবিষ্কার ক'রে কলম্বসের যে আনন্দ হয়েছিলো তার শতগুণ আনন্দে সমু উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো।

রোজ ভোরবেলা সবাই উঠ্‌বার আগে ও উঠে বুক-ডন্ দেয়, বৈঠক দেয়। নিজের শরীরের পানে চেয়ে নিজেই উৎসাহিত হয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবে, ও যেন সত্যিই একটু বল পাচ্চে।

এই যে শক্তি-সঞ্চয়ের একান্ত আখাঙ্ক্ষা, এই যে মনের দৃঢ়তা, তাড়িত শক্তির মত পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর দিয়ে ও অনুভব করে। এইটেই দিনের পর দিন ওকে টেনে নিয়ে চল্‌লো সুস্থতার দিকে।

দু'হাতে দু'খানা মোটা ভারী বই নিয়ে সমু আর্‌সির কাছে দাঁড়িয়ে নাড়াচাড়া করে, জানালার শিক ধরে ওঠ্-

বোস্ করে। শুধু এইটুকুকে অবলম্বন ক'রে চোরের মতন লুকিয়ে লুকিয়ে সমু দিন কাটায়। গায়ে ওর একটু একটু করে শক্তি হচ্চে, সাহসও যাচ্চে বেড়ে।

হঠাৎ সেদিন সমর মা'র কাছে ধরা পড়ে গেল। বকুনি খেলে যথেষ্ট—আর শুধু তাই নয়, মারও খেলো। মার খেয়ে সমর কাঁদ্‌লো কিন্তু মার সইবার মতন শক্তি যে ওর হয়েচে এইটুকুই হ'ল ওর সব চাইতে বড় সান্ত্বনা। শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার মাদুলীর মালা উঠ্‌লো তার গলায়। শাসনের মাত্রা গেল চ'ড়ে।

সমুও সোজা ছেলে নয়। সেও আবার নতুন ফন্দি বের করলে। মাদুলীর মালা নামিয়ে রেখে ও ব্যায়াম করে, ব্যায়াম শেষ হলেই আবার গলায় প'ড়ে নেহাৎ ভাল ছেলে সেজে বসে থাকে।

ক্রমে ক্ষুধা ওর বেড়ে চলেছে দারুণ। ক্ষুধার জ্বালায় সমু ছট্‌ফট্ করে। মার হাতের সযত্ন খাবারে ওর পেট ভরে না। বেশী চাইলেই বা ওকে দেয় কে। বাবার কড়া হুকুম, একছটাক সরু চালের ভাত, একটু মুসুরের জুস্ আর দু' টুকরো নেবু ছাড়া ও যেন কিছু খেতে না পায়। এক দিন যদি ওর অজীর্ণ হয় তবে আর মৃত্যুর হাত থেকে

ওকে ফেরানো যাবে না। নিত্যি তাই বাবা দাঁড়িয়ে থেকে ওকে খাওয়ান।

ভাঁড়ার ঘরের চাবি বন্ধ। কিন্তু এই দারুণ ক্ষিদে পেটে নিয়ে যে সমুর আর সময় কাট্‌তে চায়না! অনেক ভেবে চিন্তে সমু বের কর্‌লে এক ফন্দি। রোজ ভোরে উঠে ও আস্তাবলে যায়। ঘোড়ার জন্যে যে ছোলা ভেজানো থাকে দু'হাতে মুঠো মুঠো করে তাই খায়।

কিন্তু অম্‌নি করে কতদিনই বা চলে, সমু সে দিন ধরা পড়ে গেল কোচোয়ানের হাতে। বাবা ও'কে একশেষ কর্‌লেন, আর মারও যা খেলে তেমন মার ও জীবনে কোনদিন খায়নি।

যাতনায় অস্থির হয়ে সমু বিছানা নিলে। সমু এখন বড় হয়েচে, দেহে ওর শক্তি হয়েচে, মনে ওর জেগে উঠেচে সাহস। এম্‌নি ঘরের ভেতর বন্দী থেকে রাতদিন রোগের খোলস প'ড়ে মা-বাবার আদরের মাণিক সেজে থাকা আর সমু কিছুতেই সইতে পার্‌চে না।

এ কারাগার থেকে ছাড়া পাবার জন্যে সমু অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। এখানে থাক্‌লে ও যে আর বেশী দিন বাঁচবে না, তা ও সত্যি করে উপলব্ধি কর্‌তে পেরেচে;—মাদুলীর

বরমাল্য গলায় প'রে রোগের কাছে চিরজীবনের জন্যে ওকে পরাজয় স্বীকার কর্‌তে হবে। কিন্তু না, সে ও কিছুতেই হ'তে দেবে না।

এ বন্দীশালা থেকে সমু কি কিছুতেই মুক্ত হতে পার্‌বে না? মানুষ কী না কর্‌তে পেরেচে? বুকের ওপর হাতী দাঁড় করিয়েচে, জাহাজ তৈরী করে মহাসাগর পাড়ি দিয়েচে, এরোপ্লেন তৈরী করে 'এভারেষ্ট' ডিঙ্গিয়ে গেচে, আর ও কিনা সামান্য একটা ঘরের বাঁধন থেকে পালিয়ে যেতে পার্‌বে না!

সেই দিন রাত্রেই সমু কাউকে কিছু না বলে উধাও হ'ল। এক টুক্‌রো ছেঁড়া কাগজে শুধু লিখে রেখে গেল—

বাবা, মা—

আমি চলে গেলুম বলে দুঃখ কর্‌বেন না। খোঁজাখুঁজিও কর্‌বেন না; কেন না খোঁজাখুজি ক'রেও আমায় আর পাবেন না। আমি বাঁচ্‌তে চাই। মুক্ত আলো বাতাসে স্বাধীন ভাবে আমি বাঁচ্‌তে চাই। সেই জন্যেই আজ আমি আপনাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেলুম। ইতি

আপনাদের স্নেহের

সমু

সমুর আজ কি আনন্দ! শরীর-চর্চ্চা ক'রে ও রোগের হাত থেকে ছাড়া পাবে। মুক্ত আলো বাতাসে সতেজ হয়ে ও বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচ্‌বে। শারীরিক পরিশ্রম ক'রে ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা কর্‌বে—তাতে যদি ওকে রাস্তার মুটেও হতে হয় তাতেও বিন্দুমাত্র অপমান বোধ কর্‌বে না।

দীর্ঘ পাঁচ বছর সমরের শোকে বাবা মার দিন আর কাটে না। এম্‌নি ক'রে যে রোগা পট্‌কা ছেলে তাঁদের চিরদিনের জন্যে নিরুদ্দেশ হ'বে তা কে ভেবেছিলো। সমু থাক্‌লে এতদিন সে না জানি কত বড়ই হ'ত, কত সুন্দরই না তাকে দেখ্‌তে হ'ত! ভাব্‌তে ভাব্‌তে তাঁদের চোখের পাতা ভিজে ওঠে! সমুর স্মৃতি তাঁদের সমস্ত মন জুড়ে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

পূজো-আশ্রা নিয়ে তাঁরা সমুকে ভুল্‌তে চেষ্টা করেন। গ্রীষ্মের যে রোদে রাস্তার 'পিস্' গ'লে যায়, আকাশ থেকে আগুনের ফুল্‌কি খ'সে পড়ে পথিকের মাথায়, ঠিক এম্‌নি এক দিনে তাঁরা কালীঘাট থেকে বাড়ী ফিরচেন, বাড়ীর গাড়ী ক'রে। সকাল থেকে আজ এ পর্য্যন্ত ঘোড়াটার আর বিশ্রাম নেই। পরিশ্রমের আতিশয্যে তার দু গাল্‌চে বেয়ে ফেনা পড়্‌চে, নাক দিয়ে ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাস বইচে,

সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে কর্‌চে চক্‌চক্‌। রসা রোডের মোড়ে এসে ঘোড়া বার বার নাকে শব্দ কর্‌তে লাগ্‌লো। ক্রমে উত্তেজিত হয়ে সে উঠ্‌লো ক্ষেপে। অসুরের মতন গায়ে জোর, সে জোর সমস্তটা প্রয়োগ কর্‌লে ও বগী গাড়ীখানাকে হাওয়ার বেগে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। এত ওর গায়ে শক্তি; কিন্তু তবুও ও শুধু ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। কিছুতেই আর পথ চল্‌তে চায় না।

লাগাম কসে কোচোয়ান ফটাফট্‌ তার পিঠে চাবুক কস্‌তে লাগ্‌ল। যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠে ঘোড়া পিসের রাস্তার উপর পা ছুঁড়্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু তবুও এক পা ও এগোয় না। শেষে মারের চোটে উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ ঘোড়া ছুট্‌লো। শত চেষ্টা করেও আর কোচোয়ান তাকে বাগে আন্‌তে পার্‌লো না। বায়ুর বেগে গাড়ীখানা উড়িয়ে নিয়ে ঘোড়া ছুটে চল্‌লো।

রাস্তার গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, ট্রাম কাউকে সে ভ্রূক্ষেপ কর্‌লো না। একটু যদি কিছুর সাথে ধাক্কা লাগে তবেই শেষ—একেবারে চূরমার! সমরের বাবা মা চীৎকার ক'রে উঠলেন! সমস্ত লোক হায় হায় করে উঠ্‌লো—"ঘোড়া খেপ্‌ গিয়া, জান বাঁচাও, হুসিয়ার্‌!"

ভয়ে দু'পাশের লোকজন গাড়ী ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে সরে

দাঁড়ালো। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই হয় ত এখনই এক বীভৎস কাণ্ড হয়ে যাবে!

কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায়ই কেউ দেখ্‌ছে না— শুধু 'হায়! হায়!' আর 'হায় হায়!'

এম্‌নি সময় সবাই অবাক্ হয়ে দেখ্‌লে, প্যাণ্ট আর

সার্ট পরা কারখানার এক বাচ্চা মিস্ত্রি তীর বেগে গাড়ীর পিছে পিছে ছুটে চলেচে। সবাই হৈ হৈ করে তাকে মানা করল,—'মর্ যাও গে ছোক্‌রা, মর্ যাও গে!' কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে গিয়ে বজ্রমুষ্টিতে ঘোড়ার বল্গা কসে ধ'রে ফেল্‌লে। মুখের ভেতর সজোরে হাত পুরে দিয়ে তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে সেই উন্মত্ত ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে একেবারে শূন্যে ঝুল্‌তে লাগ্‌ল। হায় হায়! ঘোড়ার নালের চাট্ খেয়ে এবার না জানি তার মাথার খুলি উড়ে গিয়ে কি কাণ্ড বাধায়!

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সবাই অবাক্ হয়ে যা দেখ্‌লে তাতে তারা কেউ তাদের চোখকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লো না! সিংহের অধিক বিক্রমের কাছে আজ সেই তেজিয়ান উন্মত্ত ঘোড়াও হার মান্‌লো। শেষবারের মত ঘোড়া ভীষণ বেগে লাফিয়ে উঠে সেই বাচ্চা মিস্ত্রিকে নিয়ে ধূলোয় লুটিয়ে পড়ল। এ কী জাদু জানে সে! প্রবল একটা ঝাঁকুনি পেয়ে গাড়ীর চাকা ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেল, উপর থেকে গাড়োয়ান ছট্‌কে পড়্‌ল সাত হাত দুরে। সবাই বেঁচে গেল কিন্তু গাড়ীর ভাঙা রডের খোঁচা লেগে বাচ্চা মিস্ত্রির কাঁধের মাংস খানিকটা গেল উড়ে।

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে আজ আরোহীরা বেঁচে গেলেন। চার দিকে সাড়া উঠ্‌ল—সাব্বাস্‌! সাব্বাস্‌! সাব্বাস্‌ বাপ্‌কা বেটা!

কম্পিত পদে বাবা মা গাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কে-কে সেই বীর, আজ যে নিজের জীবনকেও বিপন্ন ক'রে তাঁদের জীবন দান কর্‌লে?

কিন্তু এ কি! সহসা তাঁরা যেন তাঁদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। অনেক দিনের পরিচিত একখানি কচি মুখের ছায়া যেন কালের কুয়াসা ভেদ করে তাঁদের চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌লো। ঠিক তেম্‌নিই ত মুখখানি! তবে এই কি তাঁদের সমর!

সমস্ত শরীর তাঁদের রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মৃত্যুভয়ে যে মুখ কালো বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, সে মুখ আশার আনন্দে হয়ে উঠ্‌লো উজ্জ্বল।

দিনের স্বচ্ছ সূর্য্যালোকে গাঢ় নীল আকাশের তলে আজ তাঁরা তাঁদের চোখের সাম্‌নে এ কি দেখ্‌লেন!

সুস্থ সুঠাম দেহ রক্তে রাঙা, বর্ম্মের মতন প্রশস্ত বক্ষ হৃৎস্পন্দনে উদ্বেলিত, সিংহের থাবার মতন দৃঢ় কঠিন বাহু, চক্ষে নির্ম্মল নির্ভীক চাহনি, শরীরে ব্যাঘ্রের অধিক

বিক্রম,—এই কি তাঁদের সমর? জীবন মৃত্যুর সমরে বিজয়ী বীর এই কি তাঁদের সেই প্রাণের চেয়েও প্রিয়তম সমু? বিপদের হাত থেকে যে অসহায়দের উদ্ধার করতে পারে, এই কি তাঁদের সেই রোগজর্জ্জরিত অস্থিচর্ম্মসার সমু? আনন্দের আতিশয্যে তাঁদের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

গ্রীসের প্রস্তরমূর্ত্তির মত অটল অচল স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থেকে সমর ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁদের বুকে। পাঁচ বছর আগে এক দিন যে মা-বাবার উপর অভিমান করে ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল, আজ আবার তাঁদের ফিরে পাবার আনন্দে ওর সমস্ত অভিমান জল হয়ে গেল।

ঘরের টান

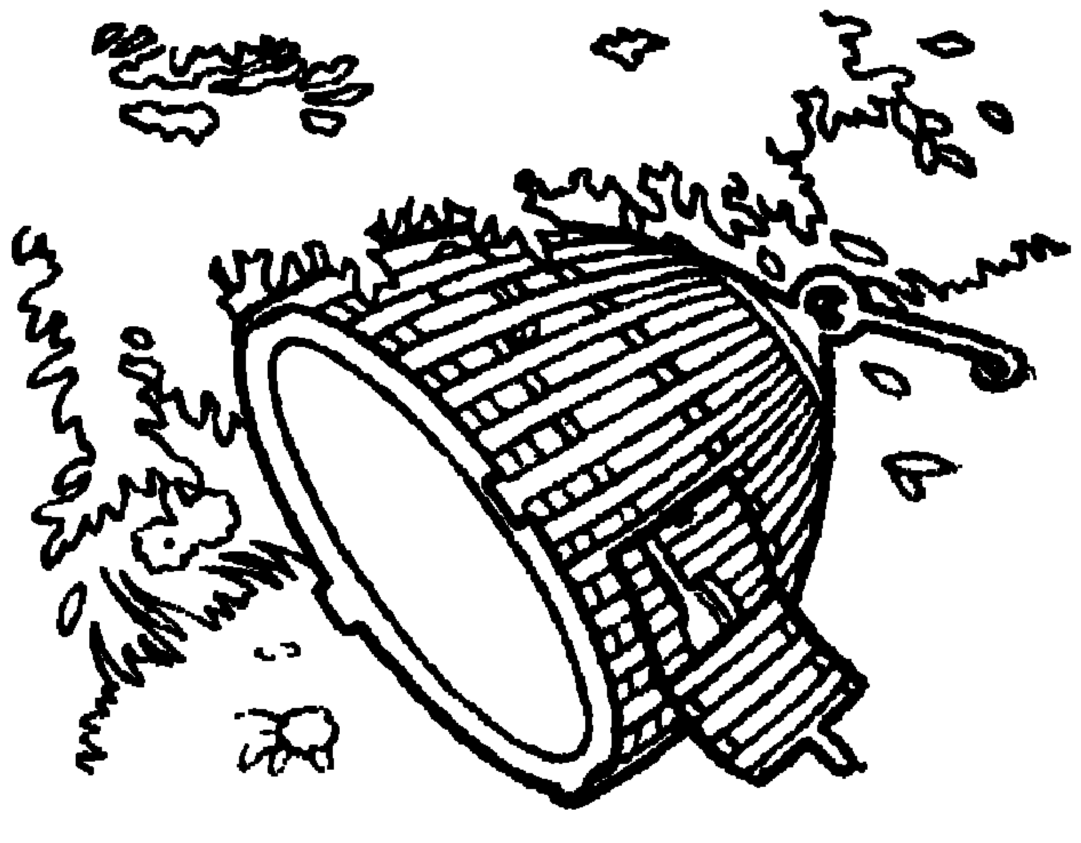

ঘরের টান

"মেণ্টু, এই মেণ্টু! তুই ইস্কুলে যাবিনে? ওখানে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে ঝোপের দিকে চেয়ে আছিস্ যে!" চম্‌কে উঠে মেণ্টু ফিরে চেয়ে বল্‌লে—"চুপ্‌!"

"চুপ্‌ কিরে—তুই ওখানে দাঁড়িয়ে কচ্ছিস্ কি?"

"আমার যা খুসি তাই কর্‌চি—তোর তাতে কি?"

"আমার তাতে কি! আচ্ছা দাঁড়া! মাকে আমি এখুনি গিয়ে বল্‌চি। রোজ রোজ তুই ইস্কুল কামাই করবি, না!" মেণ্টু বল্‌লে, "শীগ্‌গির আয় হাবুল্, মজা দেখে যা, চেঁচাস্‌নে।" ছেলেটির নাম হাবুল, মেণ্টুরই ছোট ভাই।

এগিয়ে গিয়ে হাবুল বল্‌লে, "কি রে?" হাবুলের কাঁধের উপর বাঁ হাতটা তুলে দিয়ে ডান হাতে স্থমুখের ঝোপের

দিকে কি একটা লক্ষ্য ক'রে মেণ্টু বল্‌লে, "দেখেছিস্ কি চমৎকার! ওদের মা কি চমৎকার!"

—"কাদের মা?"

"কাদের মা আবার! ঐ যে খাঁচায় তোতার বাচ্চা, ওদের মা। ঐ যে, দেখ্;—ওদের মা খাবার নিয়ে এসেচে ঠোঁটে ক'রে। দেখতে পেয়েছিস্?"

হাত তালি দিয়ে হাবুল বল্‌লে—"হ্যাঁ হ্যাঁ, এইবার দেখ্‌তে পেয়েচি! ভারি সুন্দর তোতার বাচ্চা দু'টো তো! ওদের মা'র গায়ের রং কি চমৎকার! কিন্তু ওদের গায়ের রং ওদের মা'র মত নয় কেন রে মেণ্টু?" বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে মেণ্টু বল্‌লে, "ওরা যে সবে বাচ্চা। বড় হলে দেখিস্, ওদেরও গায়ের রং কেমন খোলে।"

হাবুল জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কোথায় পেলি রে ওদের?"

"ঐতো ঐ বাব্‌লা গাছের খোড়ংএ ওদের বাসা ছিল।"

"তুই ধ'রে এনেছিস্ বুঝি ওদের?"—গর্ব্বে:বুক ফুলিয়ে মেণ্টু বল্‌লে, "হুঁ"।

"ওদের মা কিছু বল্‌লে না?"

"বল্‌লে না আবার! এই দেখ্, কাম্‌ড়ে হাত কি করে দিয়েচে।"

রক্তমাখা হাতটা দেখে হাবুল চোখ দু'টো বড় বড় ক'রে কপালে তুলে বল্‌লে, "ওরে বা-বা! ওদের মা তো ভারি

মেণ্টু বল্‌লে, "বাচ্চা ধ'রে নিলে বুঝি ওদের মা'র প্রাণে লাগে না!"

এমন সময় তাদের মা ডাক দিলেন,—"মেণ্টু, হাবুল, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে—ইস্কুলে যেতে হবে না বুঝি! শীগ্‌গির ইস্কুলে যা বল্‌চি।"

মার বকুনি খেয়ে ইস্কুলে যাবার নাম ক'রে মেণ্টু আর হাবুল বই নিয়ে বের হ'ল। কিন্তু বড় আদরের তোতার বাচ্চা দুটোকে একলা ফেলে কি আর ওদের মন ইস্কুলে যেতে চায়? তারা দুজনে চুপি চুপি ফিরে এসে সেই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল। খানিক পরে হাবুল বল্‌লে, "আচ্ছা, বাচ্চা দুটো রাত্রে শোবে কোথায়?" একটু ভেবে মেণ্টু বল্‌লে, "লোহার খাঁচায় ওদের ভারি শীত কর্‌বে, না রে হাবুল? আচ্ছা দাঁড়া, আমাদের পুরোনো তোষক থেকে খানিকটা তুলো বের করে ওদের বিছানা করে দেব'খন।"

অকেজো একটা বাইরের ঘরে বাচ্চা দু'টোকে ওরা

লুকিয়ে রাখ্‌লে। সে ঘরে ওরা ছাড়া বড় একটা কেউ যায় না। লুকিয়ে লুকিয়ে তারা বাচ্চা হু'টোকে খাওয়ায়। মা তাদের এখন আর আসে না ঠোঁটে ক'রে খাবার নিয়ে।

হাবুল বলে, "পাখীর মায়ের প্রাণে মায়া নেই। না রে মেণ্টু?" মেণ্টু বলে, "ওরা তো আর মানুষ নয়! হুদিনেই ওরা বাচ্চাদের কথা ভুলে যায়।"

সেদিন মা গেছেন বেড়াতে। মেণ্টু ও হাবুল বাচ্চা হুটোকে অন্ধকার ঘর থেকে বাইরে বের করে নিয়ে এল। অনেক দিন পর বাইরের মুক্ত আলো বাতাস লেগে যেন বাচ্চা হু'টোর চোখ খুলে গেল। মনের আনন্দে তারা খাঁচার ভেতর বার বার পাখার ঝাপ্‌টা দিতে লাগ্‌ল।

খুসি হয়ে হাবুল বল্‌লে, "দেখেছিস মেণ্টু, ওরা এখন কি চমৎকার হয়েচে—ঠিক ওদের মার মত! না? আঃ, গলার নীচে লাল দাগটা কি চমৎকার! ওদের বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে, নয় মেণ্টু?"

এতদিন আঁধার ঘরে মেণ্টু ওদের গায়ের রং ভাল করে দেখ্‌তে পায়নি। আজ দিনের আলোতে মেণ্টু অবাক হয়ে ওদের রংএর বাহার দেখ্‌ছিলো, হঠাৎ হাবুলের কথায় সে তড়াক করে উঠে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল এবং

খানিক পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে কয়েকটা পাকা লঙ্কা নিয়ে হাজির হ'ল।

অবাক হয়ে হাবুল বল্‌লে, "কি হবে ও দিয়ে ?"

"দেখ্‌ না," ব'লে শিষ দিতে দিতে মেণ্টু একটা লঙ্কা তোতার বাচ্চার মুখের কাছে ধর্‌লে, বাচ্চাটা অম্‌নি ঠোঁটে ক'রে সেটা তুলে নিলে। তারপর অপর বাচ্চাটাকে আর একটা। চোখ হু'টো বড় বড় ক'রে কপালে তুলে হাবুল বল্‌লে, "ওকি কচ্ছিস্‌ মেণ্টু ? ঝাল লেগে যে ওরা মরে যাবে !"

পা দিয়ে ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে বাচ্চা হুটো ভারি মজা করে সেই লঙ্কা খেতে লাগ্‌ল। মেণ্টু বল্‌লে, "দেখ্‌লি, ওরা কেমন খুসি হ'য়েচে !"

এতক্ষণে হাবুলের মুখে হাসি ফুট্‌ল। একগাল হেসে সে বল্‌লে, "পাকা লঙ্কা ওরা খায় তাই বুঝি ওদের ঠোঁট অত লাল টুক্‌টুকে, হ্যাঁরে মেণ্টু ?"

হঠাৎ পায়ের শব্দ পেয়ে মেণ্টু বল্‌লে, "মা আস্‌চে হাবুল, শীগ্‌গির পালা !" খাঁচাটা নিয়ে ওরা হু'জনে চোরের মতো গিয়ে ঘরে ঢুক্‌ল। মা এর কিচ্ছু জান্‌তে পারলেন না।

বাচ্চা দু'টো এখন বেশ বড় হয়েচে। আর তাদের বাচ্চা বলা চলে না। তারা এখন বাদাম, পেস্তা, ধান চিবিয়ে

খেতে পারে। লঙ্কা খেয়ে আর চোখ লাল ক'রে ঝিমোয়

না। রাগ হ'লে চোখ রাঙিয়ে মেণ্টু আর হাবুলকে শাসন করে।

ডানায় তাদের সবুজ ধানের ক্ষেতের রংএর বাহার, সিঁদুরের মতন লাল টক্‌টকে ঠোঁট, দেহের তাদের সুঠাম গড়ন। গলায় তাদের রামধনু আঁকা, বুকে রংএর বিচিত্র খেলা, পায়ে তাদের টাট্‌কা আল্‌তার রক্তিম ছোপ। মেণ্টু শিষ দিলে তারাও শিষ দেয়। কি মিষ্টি তাদের গলা! হাবুল বেচারীর ভারি দুঃখু, ও তাদের সঙ্গে শিষ দিতে পারে না।

অন্ধকারে বন্ধ ঘরের ভেতর পাখীরা আর থাক্‌তে চায় না। তারা চায় মুক্ত আলো বাতাস, স্বাধীন জীবন। বাইরে স্বাধীন পাখীদের কলরব শুনে আনন্দে তাদেরও বুক নেচে ওঠে—আনন্দে তারাও দিশেহারা হয়ে গান গায়। লোহার পাতে ঘেরা খাঁচার দেয়াল ভেঙ্গে তারা বাইরে যেতে চায়। ভয়ে মেণ্টুর বুক দুর্‌ দুর্‌ করে কেঁপে ওঠে! পাখী দু'টোর হ'ল কি? রাতদিন কেবল ডাকাডাকি। মা যদি জান্‌তে পারে তবে কি হবে! হাবুল বল্‌লে, "মেণ্টু, ওরা আর একলা একলা ও ঘরে থাক্‌তে চায় না রে। চল্‌ ওদের না হয় পড়ার ঘরে খাটের নীচে লুকিয়ে রাখি।"

খাটের নীচে বড় আদরের তোতা হু'টোকে লুকিয়ে রেখে মেণ্টু আর হাবুল ভাল ছেলেটির মতন পড়া করে। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখে তারা কি কর্‌চে। হঠাৎ কোনো সময় মা ঘরে এলে ওরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে সুরু করে দেয়—"ওয়ান্স আপন্ এ টাইম দেয়ার লিভ্‌ড্ এ ম্যান্…" পাখী হুটোও ওদের গলার স্বর অনুকরণ কর্‌তে শিখেচে; তারাও বলে, "ওয়ান্স আপন্ এ টাইম……"

এমনি করে দিনের পর দিন যায়। মা পাখীর কথা জানতেও পারেন না।

এরই ভেতর একদিন হয়ে গেল এক কাণ্ড! মা পড়া বলে দিচ্ছেন, মেণ্টু আর হাবুল চুপকরে হু'জনে হুটো আঁক কস্‌চে—মন কিন্তু তাদের খাতায় নয়, খাটের নীচে।

মা বল্‌লেন, "হ'ল রে মেণ্টু? কতক্ষণ লাগে একটা ভাগ অঙ্ক কস্‌তে!"

হঠাৎ আওয়াজ হলো, "ওয়ান্স আপন এ টাইম…"। মা ধম্‌কালেন, "এই বুঝি আঁক কসা হচ্ছে হাবুল? ইংরেজী পড়্‌তে বল্‌লে কে তোকে?"

আবার ঠিক তেমনি হাবুলের গলার স্বর—"ওয়ান্স আপন এ টাইম…"

মেণ্টু আর হাবুলের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। মার চোখে আর তারা ধূলো দেয় কি ক'রে? খাটের নীচে তোতার বাচ্চা দু'টোকে দেখ্‌তে পেয়ে মা চোখ রাঙিয়ে বল্‌লেন, "কিরে, লেখা পড়ার নাম নেই, লুকিয়ে লুকিয়ে তোতার বাচ্চা পোষা, না?" মেণ্টু ও হাবুল মাথা হেঁট্‌ ক'রে বসে রইল।

টেবিলের উপর একটা স্কেল পড়েছিল, মা সেটি কুড়িয়ে নিয়ে বল্‌লেন, "বের কর্‌ খাঁচা খাটের নীচ থেকে।"

মেণ্টু আর হাবুল দু'জনে মুখ চাওয়া চাওয়ি কর্‌তে লাগল। কিন্তু কি করে? শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেণ্টু ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নীচে গিয়ে খাঁচাটা টেনে বের কর্‌লে। মা বল্‌লেন, "দোর খুলে দে খাঁচার এখুনি।"

দু'চোখ বেয়ে মেণ্টুর জল এলো। এত আদরের তোতা গেলে থাকবে কি নিয়ে? কিন্তু মার কথার উপর ওরা কোন দিনই কথা কইতে পারেনি, আজও পারলে না।

দোর খোলা পেয়ে তোতা দু'টো হঠাৎ একবার পাখা ঝাপ্‌টা দিয়ে একেবারে মেঝেতে এসে বস্‌ল। হঠাৎ তাদের মনে পড়ে গেল, ঠিক এম্‌নি করে তো তাদের মা উড়ে এসে তাদের কাছে বস্‌ত। ছোট বেলায় তারা যখন

গাছের খোড়ং থেকে মুখ বের করে নীল আকাশের পানে চাইত, তখন তাদের ভারি ইচ্ছে করত মার সাথে উড়ে যেতে। কিন্তু ভয় হ'ত পাছে উড়তে গিয়ে পড়ে যায়।

আজ আর তাদের সে ভয় নেই। ছাড়া পেয়ে মনে ভারি স্ফুর্ত্তি। স্বাধীনতার কি আনন্দ! পাখা ঝাপ্‌টা দিয়ে তারা বার বার ডেকে উঠ্‌ল। কত রকম করে শিষ্‌ দিল। আজ মুক্ত আকাশ তাদের হাত ছানি দিয়ে ডাক্‌চে।

রইল প'ড়ে হাবুল আর মেণ্টু, রইল প'ড়ে তাদের সেই ছোট্ট লোহার ঘর; টি-টি ক'রে তারা বার কয়েক সেই ঘরটাতে উড়ে বেড়াল, তারপর ডানা মেলে দিল একেবারে বাইরে—নীল আকাশের দিকে।

টল্‌ টলে দু'ফোঁটা চোখের জলে মেণ্টুর দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে এলো। টপ্‌ টপ্‌ ক'রে কয়েক ফোঁটা অঙ্কের খাতার উপর গড়িয়ে পড়ল; ফুলে ফুলে সে শুধু কাঁদতে লাগ্‌ল। অভিমানে মুখ ভার করে গাল ফুলিয়ে হাবুল মা'র মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সমস্ত দিন ধরে তোতা দু'টো উড়ে বেড়াল। কোথাও দেখ্‌ল পাহাড়, কোথাও সমুদ্র, কোথাও বন, কোথাও নদী। রঙ্গিন্‌ উৎসাহে তারা মেতেচে—আকাশ থেকে আর তারা

নাম্‌তে চায় না। নীল আকাশের বুকে গা ভাসিয়ে দিয়ে উড়ে বেড়াতে যে এত আনন্দ, এ তারা কোনদিন ভাব্‌তেও পারেনি। তারা ক্রমেই উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। হাল্‌কা মেঘ ছাড়িয়ে তারা আরও উর্দ্ধে উঠ্‌ল।

উড়্‌তে উড়্‌তে তাদের ডানা হয়ে এল অবশ, গলা গেল শুকিয়ে—তাইত সারা দিন যে তাদের কিচ্ছু খাওয়া হয়নি। এতক্ষণে তারা বুঝ্‌তে পারলে যে তাদের ভয়ানক ক্ষুধা পেয়েচে, তেষ্টায় তাদের ছাতি ফেটে যাচ্চে।

এক নিমেষে আকাশে ওড়ার রঙ্গিন্ স্বপ্ন তাদের ভেঙ্গে গেল। তাদের মনে পড়ল সেই ছোট্ট লোহার খাঁচাটার কথা। সেখানে তারা বড় সুখে ছিল। খাবার ভাবনা তাদের কর্‌তে হত না। ছোট্ট ছেলে দুটি তাদের কত আদর কত যত্নই করত! সোহাগ করে গায়ে হাত বুলিয়ে দিত! তারা আজ মুক্ত, স্বাধীন, কিন্তু তবুও তাদের সেই ছোট্ট বন্ধু দুটির জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল। খাঁচায় ফেরবার জন্যে তারা ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। বনে বনে জঙ্গলে জঙ্গলে তারা পাঁতি পাঁতি করে খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌ল; কিন্তু কোথায় তাদের ছোট্ট লোহার ঘর?

হঠাৎ কোথা থেকে ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি সুরু হল।—সর্ব্বনাশ!

এই ঝড় বাদ্‌লার হাত থেকে তারা রক্ষা পাবে কি ক'রে? হায় রে, কোনদিন ত তারা এত বিপদে পড়েনি! চোখ দিয়ে তাদের জল এল। অতিকষ্টে দুজনে একটা গাছের ডালে বসে রইল, তবুও যদি তারা ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

মেণ্টু আর হাবুল সারাদিন তাদের পাখী দুটির খোঁজে

চানা ছোলা আর সেই লোহার খাঁচাটা নিয়ে শিষ দিয়ে দিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াল; কিন্তু কোথাও আর

তোতাদের পেলো না। রোদে পুড়ে, বিষ্টিতে ভিজে মেণ্টু আর হাবুল হয়রান হয়ে গেল। তাদের ভয়ানক রাগও হ'ল সেই তোতার বাচ্চা তুটোর উপর। লক্ষ্মীছাড়ারা এমন নেমকহারাম! এত যত্ন এত আদর সব ভুলে গেল। রাগে অভিমানে খাঁচাটা ছুঁড়ে ফেলে তারা বাড়ী ফিরে গেল।

জল ক্রমে কমে এ'ল। কিন্তু ঝড়ো হাওয়া চল্‌ল প্রবল বেগে। শত চেষ্টা করেও তোতা তুটো আর গাছের ডালে বসে থাকতে পারল না। পা তাদের অবশ, দেহ তাদের অসাড় হয়ে এসেচে। ঝাপ্‌টা হাওয়ার ধাক্কা সইতে না পেরে তারা ডাল থেকে ছিট্‌কে পড়ে গেল। ছোটটি যে কোথায় গেল বড় আর তাকে দেখ্‌তে পেল না। পাখা তু'টো মেলে সে উড়্‌তে চাইল কিন্তু পাখা তখন তার জলে ভিজে ভারী হয়ে গেছে। ধুপ্‌ করে সে মাটির উপর পড়ে গেল। বুকে তাব ভয়ানক চোট লেগেচে, তবুও সে একবার তার ছোট্ট ভাইটিকে ডাক্‌তে চেষ্টা করল। কিন্তু গলা দিয়ে তার কথা বের হ'ল না। অতিকষ্টে মাথাটা তুলে সে এক-বার এদিক সেদিক চাইল—চোখের সামনে স্বপ্নের মতন সে দেখ্‌লে তাদের সেই ছোট্ট লোহার খাঁচাটা। সে তার চোখ তুটোকে বিশ্বাস করতে পারল না। মাথাটা একবার নাড়া

দিয়ে সে ভাল করে চাইল—না, সত্যিই তো তা'দের সেই সুখের ঘর! আনন্দে তার হু'চোখ বেয়ে জল এল। কোন রকমে গড়াতে গড়াতে সে গিয়ে সেই খাঁচার ভেতর প্রবেশ করল। মনে মনে বল্‌ল, সে যদি তার ছোট ভাইকে ফিরিয়ে পায়, তবে আর কোনদিন সেই সুখের ঘর ছেড়ে কোথাও যাবে না। সে ডাকল—"ভাই, ছোট্ট ভাইটি আমার! এই ঝড় জলে কোথায় গেলি তুই? আয় দেখ্‌, আমাদের সোনার ঘর ফিরে পেয়েছি।"

তার মনে পড়ল হাবুল আর মেণ্টুর কথা। তারা কই একটা ঢোক গিলে সে শিষ্‌ দিয়ে মেণ্টু আর হাবুল্‌কে ডাক্‌তে গেল; কিন্তু ঠাণ্ডায় সে তখন প্রায় জমে বরফ হয়ে গেছে—গলা দিয়ে তার স্বর বের হ'ল না। ধীরে ধীরে সে ঢ'লে পড়ল তার সেই বড় সুখের ছোট ঘরখানির বুকে।

ঝমরুর অভিমান

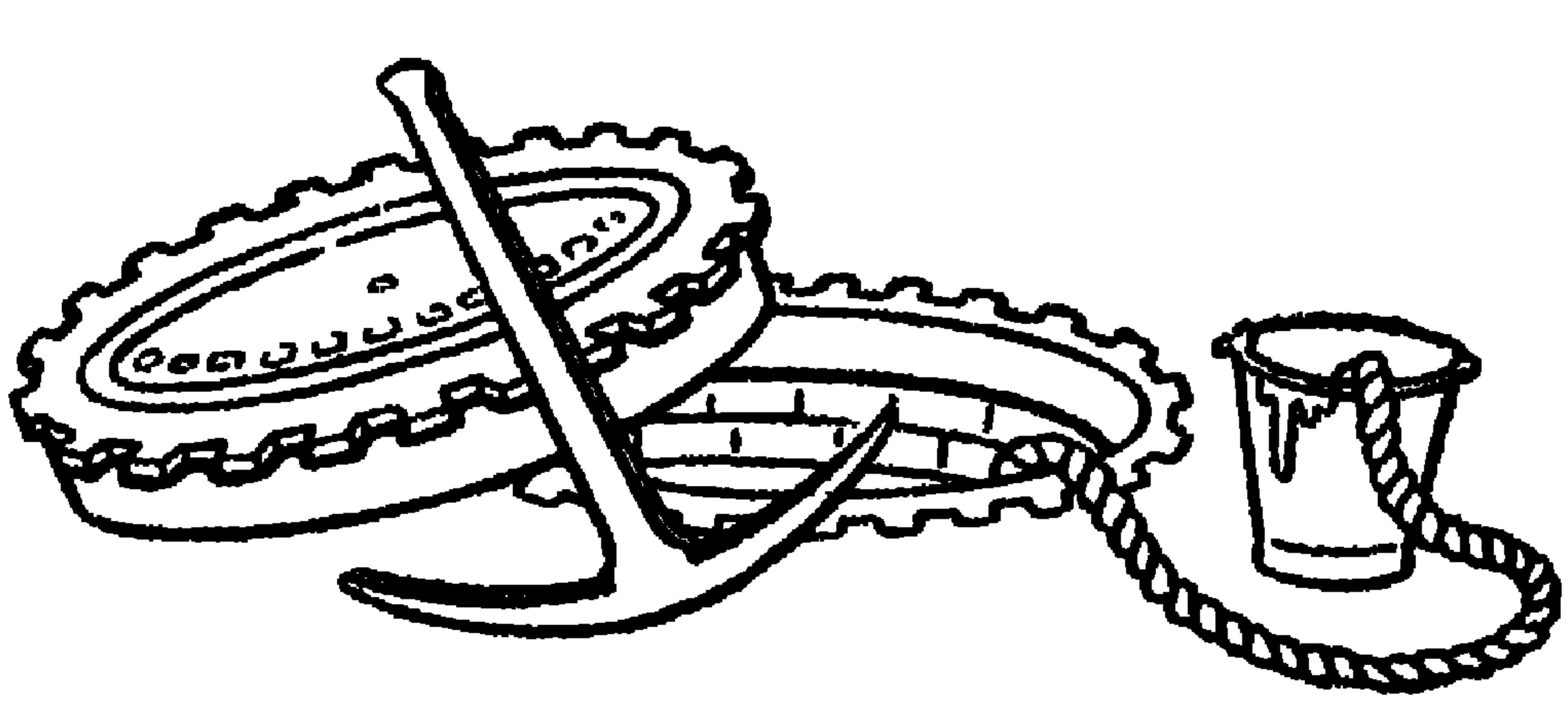

ঝমরুর অভিমান

বড় রাস্তা গিয়ে যেখানে শেষ হয়েচে, সহরের বাইরে ঠিক সেই জায়গাটা জুড়ে ছোট্ট একটা বস্তি। সরু একটা গলি—তারই দু'ধারে কতগুলো ভাঙ্গা পুরনো মাটির ঘর। আলো বাতাস বোধ করি ভুলেও তার ভেতর কোনোদিন উঁকি দেয় না। এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ী যেতে হ'লে এক হাঁটু পাঁক ভাঙ্‌তে হয়। গলির দুধারের খোলা নর্দ্দমার দুর্গন্ধে দম আট্‌কে আসে।

বস্তিটার সুমুখ দিয়ে একটা রেল লাইন, কিন্তু সে মানুষ চল্‌বার জন্যে নয়; সহরের যত সব জঞ্জাল বইবার জন্যে।

ঝিকিমিকি

তখনও পূবের সূর্য্য পশ্চিমে ঢলে পরেনি—বেলা যাই যাই ক'রেও বস্তির পেছনের নারকোল গাছগুলোর চুড়োয় চুড়োয় আট্‌কে আছে। এম্‌নি সময় ধোঁয়ায় অন্ধকার ক'রে ভোঁস্ ভোঁস্ কর্‌তে কর্‌তে একটা ময়লার গাড়ী এল। গাড়ী চলে গেলে দেখা গেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে,—হাতে তা'র একটা কোদাল আর ঝুড়ি। বোধ হয় ট্রেণ থেকে নাম্‌ল। ছেলেমিভরা ওর মুখখানা কি একটা ব্যথার ছাপে কালো মলিন হয়ে গেছে।

ছেলেটি ঝুড়ি আর কোদালটা কাঁধে ফেলে বস্তির দিকে চ'লেচে ঠিক এমন সময় একখানা মোটর ওর পাশ দিয়ে চলে গেল। ও চেয়ে দেখলে মোটরে ওরই বয়সী একটি ছেলে। মোটর থেকে ছেলেটি এক দৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে রইল; কিন্তু গাড়ী এত বেগে চল্‌ছিল, যে বায়স্কোপের ছবির মতন দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই বস্তিটা অদৃশ্য হ'য়ে গেল। সহরের কত ছেলেই ত' ও দেখেচে; কিন্তু কই এম্‌নি করে তো কেউ কোনদিন ওর পানে তাকায়নি। যতদূর দু' চোখ যায় ও তাকিয়ে রইল।

উঁচু নীচু খোয়ার রাস্তায় মোটর লাফাতে লাফাতে

ছুটে চলেচে; তা'র ঝাঁকুনি খেয়ে 'হুড়ের রডের' সাথে ছেলেটির মাথা বার বার টক্কর খাচ্ছে; কিন্তু সে দিকে ওর খেয়াল নেই, ও বসে বসে শুধুই ভাব্‌চে সেই ছেলেটির কথা। স্কুলে তো ওর কত বন্ধুদেরই দেখেছে; কই..কাউকেও তো এত ভাল ঠেকেনি। আজকে যে এক মুহূর্ত্তের জন্যে ও ছেলেটিকে দেখেই ভালবেসে ফেল্‌লে! ওর যে নবেনের সাথে এত ভাব,—তাকেও তো ও এমন ক'রে কোনদিন ভালবাস্‌তে পারেনি! আজকের এই মুহূর্ত্তের দেখাটা যেন ওর ছোট্ট মনটুকু জুড়ে কত বড় একটা ছাপ দিয়ে গেল। ও শুধু এই কথাটাই ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

কখন যে মোটর এসে একটা বাড়ীর ফটকে দাঁড়িয়েচে ও বুঝ্‌তেও পারে নি। হঠাৎ হুস্ হ'ল মোটরের ভেঁপু শুনে।

ওর বাবা মোটরের আলো নিবিয়ে দিয়ে নেমে পড়লেন; ও-ও নাম্‌ল। এই ওর বাবার সেই চিত্রকর বন্ধুর বাড়ী,—যাঁর কথা ও ওর বাবার মুখে অনেকবার শুনেচে; কিন্তু কোনদিন যাঁকে চোখে দেখে নি। ও ছবি দেখ্‌তে—শুধু দেখ্‌তে কেন আঁক্‌তেও—খুব ভাল

বাসে; তাই ওর বাবা ওকে সাথে করে নিয়ে এসেচেন ছবি দেখাতে।

দোতলার একটা হল ঘরে যেতেই ওর বাবার বন্ধু হাস্‌তে হাস্‌তে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লেন, "তোমার নামই অনুপম বুঝি?" কোলের কাছে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ও উদাসভাবে বল্‌লে—"হ্যাঁ, সবাই ডাকে 'অনু'। কিন্তু আমায় একটা ছবি এঁকে দেবে কাকাবাবু?"

অনুর মুখে 'কাকাবাবু' ডাকটি ভারি মিষ্টি শোনাল। ও এই প্রথম ওর বাবার বন্ধুকে 'কাকাবাবু' বলে সম্বোধন করলে।—কিন্তু ওর মনে স্ফূর্ত্তি নেই কেন?

কাকাবাবু বল্‌লেন—"কি ছবি, অনু?" অনু বল্‌লে,—"চল আমার সাথে, আমি তোমায় দেখাব।"

কাকাবাবু মোটরে ষ্টার্ট দিলেন। অনু তাঁর পাশে কোল ঘেঁসে বসে রইল। মোটর ছুটে চল্‌ল। চল্‌তে চল্‌তে সেই বস্তিটার কাছে রেল লাইন পেরিয়ে যেতেই অনু বল্‌লে—"এই খানে,—এই খানে থামাও কাকাবাবু!"

চল্‌তি গাড়ীর ঘস্ ঘস্ শব্দে এতক্ষণ কিছুই শোনা যায় নি। মোটর থাম্‌তেই একটা করুণ কান্নার রেশ

ভেসে এল। অনুর মন একমুহূর্ত্তে মলিন হয়ে গেল। এমন করেও আবার মানুষে কাঁদে।

গাড়ী থেকে নেমে অনু ওর কাকাবাবুর হাত ধ'রে সুমুখের সেই সরু গলিটা দিয়ে এগিয়ে চল্‌ল। এঁদো পচা গলি—দুধারের মেটে ঘর গুলো যেন তা'র টুটি চেপে ধরেচে। এমন জায়গায়ও আবার মানুষে থাকে।

পচা পাঁকের দুর্গন্ধে রুমালে নাক চেপে কাকাবাবু বল্‌লেন—"এ আবার কোথায় চল্‌লিরে? এ যে মেথরের বস্তি।"

অনু কিছু বল্‌লে না, তেমনই ভাবে এগিয়ে চল্‌ল। ও যেন কাকে খুঁজে বেড়াচ্চে। গলির একটা মোড় ঘুর্‌তেই অনু দেখলে ভাঙা একটা ঘরের দাওয়ায় বসে কে কাঁদ্‌চে। কাছে গিয়ে দেখ্‌লে সেই ছেলেটি। এক মুহূর্ত্ত অনু সেইখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ওর কাকাবাবুর হাত ছেড়ে দিয়ে ছেলেটির হাত ধরে বল্‌লে—"কাঁদ্‌ছ কেন ভাই?"

ঘরের দাওয়ায় একটা কেরোসিনের আলো টিপ্‌ টিপ্‌ করে জ্বল্‌ছিল; তারই ক্ষীণ আলোকে অনুর কাকাবাবু

যে দৃশ্য দেখ্‌লেন, তাঁর শিল্পীর চোখে বোধ করি এমন দৃশ্য আর কোন দিন দেখেননি।

দু' গাল বেয়ে ছেলেটির জল গড়িয়ে পড়্‌ছে। এক দৃষ্টে সে অনুর মুখের পানে চেয়ে আছে।

অনু ওকে কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লে—"তোমার নাম কি ভাই?" ছেলেটি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে—"ঝম্‌রু!" অনু বল্‌লে—"তুমি কাঁদছ কেন? ঝম্‌রু সহসা কি উত্তর দেবে ভেবে পেলে না। তারপর একটা ঢোক গিলে বল্‌লে—"সারাদিন কিছু খাইনি—মাইজির শক্ত বেমার হয়েচে।"

অনু বল্‌লে—"কোথায় তোমার মাইজি?" ঝম্‌রু হাত দিয়ে সেই ভাঙা ঘরটা দেখিয়ে দিলে। অনু দরজার কাছে গিয়ে দেখ্‌লে—ভিজে সঁাৎ সেঁতে মেজের এক কোণে একটা শত ছিন্ন কাঁথা মুড়ি দিয়ে কে পড়ে রয়েচে। অন্ধকার ঘর, ভাল করে দেখা যায় না। অনু আলোটা উঁচু করে ধর্‌ল। এই তবে ঝমরুর 'মাইজি'। কিন্তু একি মানুষের চেহারা? এ তো কয়েক খানা চাম্‌ড়ায় ঢাকা হাড় ছাড়া কিছুই নয়!

অনু আর চোখের জল রাখ্‌তে পার্‌লে না; ঝর্ ঝর্ করে ওর দু'গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল। দুনিয়ায়

-"ছিঃ অন্তু কেঁদনা",

এম্‌নি কষ্টের ভেতর দিয়েও আবার মানুষে বেঁচে থাকে। অনু ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠ্‌লো।

কাকাবাবুর চোখও ছল্ ছল্ করে উঠ্‌ল। অনুর হাত ধরে কাছে টেনে এনে বল্‌লেন—"ছিঃ অনু কেঁদ না।" তারপর ওর হাতে দু'টো টাকা দিয়ে বল্‌লেন—"দিয়ে দাও ওদের।" ছেলেটিকে কাছে ডেকে বল্‌লেন "তুমি যেও আমি তোমার ছবি আঁক্‌ব। তাতে আরও টাকা পাবে, কেঁদো না।"

অনু টাকা দু'টো ঝম্‌রুর হাতে দিয়ে বল্‌লে—"ওষুধ কিনে খাইয়ো—মাইজির অসুখ সেরে যাবে। আর এই কাগজে ঠিকানা লেখা আছে, যেয়ো আমাদের বাড়ী। কৃতজ্ঞতায় ঝম্‌রুর দু'গাল বেয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো।

সাত দিন যায়, ঝম্‌রু আসেনি। অনু রোজই ভাবে ঝম্‌রুর কথা। ইস্কুল-ফিরতি পথে ও মোটরে বসে বসে ভাবে, আজ হয় ত মোটর গিয়ে দাঁড়াতেই দেখ্‌বে ঝম্‌রুকে। ঝম্‌রুর দেখা পেলে ও তাকে বক্‌বে—কেন সে এতদিন আসে না। আবার ঝম্‌রুর দুঃখের কথা মনে হতেই ওর চোখের পাতা ভিজে আসে। মোটরের গদিতে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে ও ঘুমিয়ে পড়ে।

ঝিকিমিকি

সে দিন কি একটা ছুটির দিন। অনু ওর পড়ার ঘরে বসে বসে ছবি আঁক্‌ছিল, ওর 'পপি' কুকুরটা কান খাড়া করে ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠ্‌লো। মুখ তুলে বাইরের দিকে চাইতেই ওর বুক্‌টা কেঁপে উঠ্‌লো। ও যেন ওর চোখ ছু'টোকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লো না। ছুটে বাইরে এসে থমকে দাঁড়াল—"কে, ঝম্‌রু না?—কিন্তু এ কি চেহারা হয়ে গেছে তোমার?" ঝম্‌রু মুখ তুলে অনুর দিকে চাইল। ওর চোখে জল কেন? অনু ঝম্‌রুর হাতখানা ধরে বল্‌লে—"কাঁদ্‌ছ কেন ঝম্‌রু?"

ঝম্‌রুর ছুঃখের বাঁধ ভেঙে গেল—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে—"মাইজি"—তারপর আর কিছু বল্‌তে পার্‌লে না, ছু'হাতে মুখ ঢেকে সেইখানে বসে পড়্‌ল।

ঝম্‌রু অনুদের বাড়ীতেই থাকে। ওর কাজের ভেতর অনুর 'পপি' কুকুরটাকে দেখা আর ওর পায়রা, কাকাতুয়ো এবং খরগোসটাকে খাওয়ান।

অনুর ভালবাসর ঝম্‌রু ছু'দিনেই ওর মার কথা ভুলে গেল। সবাই যখন বেড়াতে যায়, ও তখন একলা গেটের

পাশে ওর ছোট ঘর খানিতে বসে শুধুই ভাবে অনুর কথা। অনু যেন ওর কত আপনার।—এমন আপনার ক'রে তো ওকে কেউ কোন দিন ভালবাসেনি। পূর্ব্বজন্মে অনু আর ও যেন দুটি ভাই ছিল। এম্‌নি ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন যে রাত হয়ে যায় ও জান্‌তেও পারে না। হঠাৎ ওর খেয়াল হয়। মোটরের ভেঁপু শুনে। ছুটে গিয়ে ঝম্‌রু মোটরের দরজা খুলে দেয়। পপিটা যেদিন দুষ্টুমি করে ও সেদিন বেচারাকে গলায় চেন পড়িয়ে কয়েদ রাখে। পপি হাজার বার লেজ নেড়ে ওর ক্ষমা চাইলেও আর তাকে ছাড়ে না।

কতদিন অনু কত ভাল ভাল নতুন রকমের খাবার ঝম্‌রুকে পকেট থেকে বের করে দেয়। ও সে সবের নামও জানেনা।

সে দিন অনু ইস্কুল থেকে এল; কিন্তু তেম্‌নি ছুটে এসে আর কেউ ওর হাত থেকে বইগুলো নিলো না, মোটরের দরজাও খুলে দিল না। ও গাড়ী থেকে নেমে ঝম্‌রু ঝম্‌রু করে ডাক্‌লো—কেউ সাড়া দিলে না। ও গিয়ে গেটের পাশে সেই ছোট ঘরখানার কাছে দাঁড়ালো।—দরজা খোলা, ঝম্‌রু নেই! অনু দরোয়ানকে জিজ্ঞেস কর্‌লে, দরোয়ান বল্‌লে—"হাম্‌কো মালুম্ নেহি খোঁকাবাবু।"

অনু ছুটে ওর মার কাছে গেল। মা কি একটা সেলাই কর্‌ছিলেন। অনু বল্‌লে—"মা, ঝম্‌রু কই?" মা চোখ রাঙিয়ে বল্‌লেন—"লেখাপড়া নেই, রাতদিন ঐ লক্ষ্মীছাড়া মেথরের ছেলের সাথে ঘুরে বেড়ান না?" ফের যদি ওর নাম কর্‌বি তো বুঝ্‌বি মজাটা!"

মার মুখের উপর কোন কথা কইতে কোন দিনই ও পারেনি। আজও পার্‌লো না। ওর কেবল একটা কথাই বারবার মনে হ'ল—"কেন? কি এমন অপরাধ ও ক'রেচে যার জন্যে ঝম্‌রুকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে এক 'ফুট-পাথ্‌' ছাড়া যে ঝম্‌রুর দাঁড়াবার আর কোন ঠাঁই-ই নেই—সেই কথাটা ভাব্‌তেই অনুর বুক ফেটে কান্না এল। কিন্তু মুখ ফুটে এর প্রতিবাদ কর্‌তে ও সাহস করলো না। নিজের ঘরে এসে ও শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

অনুর পড়ায় মন বসে না। ইস্কুলে গিয়ে আন্‌মনা হয়ে কি ভাবে—মাষ্টার মশাইর কাছে বকুনি খায়। ঝম্‌রুর স্মৃতি যেন কাজে অকাজে ওকে আঘাত দেয়। কাকাতুয়াটার মুখে এখনও ঝম্‌রু ডাক লেগেই আছে। ক্ষুধা পেলেই

হতভাগা 'ঝম্‌রু ঝম্‌রু' করে বাড়ীটাকে মাথায় ক'রে তোলে। এত প্রিয় যে ওদের ঝম্‌রু—তাকে আজ বিদায় করে দিলো কোন অপরাধে ?

সে দিন অনুর জন্মদিন। বাপ-মায়ের বড় আদরের ছেলে ও। ওর জন্মদিনে কত আমোদ আহ্লাদই না হয়। ওর বন্ধুরা সব আসে, ওর বাবার বন্ধুরা ; ওর বড়দি, ছোড়্দি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ আর বাকি থাকে না। আজ সেই পয়লা আশ্বিন। তের বছর আগে এম্‌নি এক পয়লা আশ্বিনে পূবের আকাশ যখন আরক্তিম হয়ে উঠেছিল সেই রক্তিম আলোতে ও প্রথম চোখ মেলে চেয়েছিল। আজও সেই দিন।

দোতলার 'হল' ঘরটাকে আজ নূতন করে সাজানো হয়েচে। মেজেতে বড় একটা গাল্‌চে পাতা। ঘরটাতে লোক গিজ্‌ গিজ্‌ করচে। যারা আস্‌বার বাকি ছিল তারাও একে একে আস্‌চেন। ঠিক মাঝখানে বড় একটা টেবিলের উপর অনুর উপহারের জিনিষ গুলো সাজানো। ওর ছোড়্দি এস্‌রাজ বাজিয়ে গান ধরেচে। অনুর ক্লাশ-ফ্রেণ্ডরা আজ ওর সাথে একটা কথা কইবার জন্যে কতই না ইচ্ছুক। এততেও অনুর মনে স্ফুর্ত্তি নেই কেন ?

আজকের এই উৎসবের দিনে যদি ও মন-মরা হয়ে থাকে, তো উৎসব আবার কিসের ?

অনু আর ঘরে থাকতে পারলে না। সিঁড়ি বেয়ে একে বারে নীচে নেমে এল। কি মনে করে বড় রাস্তায় গিয়ে ও বাসে চড়ে বসলো। সেই বস্তিটার কাছে এলে ও বাস্ থেকে নামলো। সামনেই সরু গলিটা ধরে এগিয়ে চললো। এক পাল শূওর ওকে দেখে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পালালো; কিন্তু সেদিকে ওর খেয়াল নেই। ও ঝমরু ঝমরু করে কত ডাকলো কিন্তু কেউ সারা দিলে না। সারাটা বস্তি ঘুরেও ও আর ঝমরুকে পেলো না।

হঠাৎ অনুর বাড়ীর কথা মনে প'ড়ে গেল—আজ বাড়ী ফিরে মার কাছে ওকে নাজানি কত বকুনিই খেতে হবে। ভাবনায় ওর মুখটা কালো হয়ে গেল। বড় রাস্তাটার ধারে এসে ও বাসের জন্য দাঁড়িয়ে রইলো।

হঠাৎ একটা মোটরের জোর 'ব্রেক্' চাপার খড়্ খড়্ শব্দে চমকে উঠে ও চেয়ে দেখলে মোটর থেকে ওর কাকাবাবু অনু-অনু বলে ডাকছেন। ও গিয়ে মোটরে উঠলো। গদির উপর সাদা কাগজে জড়ানো লাল ফিতেতে বাঁধা কয়েক খানা বই, অয়েল পেপারে মোড়া

কতগুলো ফুলের মালা, কাগজের বাক্সে জরিপাড়ের কাপড়, সিল্কের জামা—এ গুলো তো ওরই জন্মদিনের উপহার দেবার জন্যে ওর কাকাবাবু নিয়ে যাচ্ছেন। ঐগুলো ওর আজ হাতে তুলে নিতে হবে—হয়ত গায়েও পর্‌তে হবে—লজ্জায় ঘৃণায় ওর মুখটা লাল হয়ে উঠলো।

গাড়ী সহরের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেচে। অনুর চোখ দু'টো পথের মাঝে যেন কাকে খুঁজে বেড়াচ্চে।

হঠাৎ মাঝ পথে গাড়ী থেমে গেল। অনু দেখ্‌লে পথের মাঝে কতগুলো লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে গাড়ী চলার পথ বন্ধ করে ফেলেচে। একটু পরই ও শুনতে পেল ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন ঝমরু ঝমরু ক'রে চেঁচাচ্চে।

ঝম্‌রু! পথের মাঝে ঝম্‌রু? তবে কি সে গাড়ী চাপা পড়েছে! অনুর বুকটা দুর দুর করে কেঁপে উঠল। এক লাফে গাড়ী থেকে নেমে ও ভীড় সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

পচা দুর্গন্ধে পেটের ভেতর মুচড়ে ওঠে—রাস্তার একটা চোরা নর্দ্দমা খোলা তারই পাশে পিচের রাস্তার ওপর ঝম্‌রুর ঠাণ্ডা দেহটা জমে বরফ হয়ে রয়েছে—সমস্ত শরীরে তার

কাদা। ঝমরু তাহলে নর্দ্দমা সাফ করতে নেমেই প্রাণ হারিয়েচে।

শক্তমুঠিতে চুলগুলো ক'সে ধরে অনু সেইখানে বসে পড়ল—প্রাণপণ জোরে ও কাঁদ্‌তে চাইলে কিন্তু গলা দিয়ে ওর শব্দ বের হ'ল না। এমন দিনেও আবার মানুষে মরে!

ঝমরুকে যে ওর মা সেদিন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে কি এমনি করে ওর কাছ থেকে চিরদিনের

ওরে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যে? যে পথে লোকে মোটরে চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়, তারই অন্তরে যে আজ ওর নিশ্বাসটুকু হারিয়ে গেল তার জন্যে তো কেউ এক কোঁটা চোখের জলও ফেল্‌লো না! মেথরের ছেলে বলে কি ওর কোন সম্ভ্রমই নেই। এত অন্যায় দুনিয়ায় কিসের জন্যে!

অনু পাগলের মত ছুটে গিয়ে মোটর থেকে ওর জন্ম দিনের উপহারের জিনিষ গুলো নিয়ে এল। ফুল গুলো দিয়ে ও মনের মতন করে ঝম্‌রুকে সাজিয়ে দিলে। রুমাল দিয়ে ওর গা মুছিয়ে দিয়ে জরি পাড়ের কাপড়খানা ওর কোমরে জড়িয়ে দিলে। এসেন্সের বোতল খুলে ওর গায়ে ছিটিয়ে দিলে। সিল্কের জামাটা দিয়ে ওর গা দিলে ঢেকে—কিন্তু ঝম্‌রু আর চোখ মেলে চাইল না। মুখ ভার করে—ঠোঁট ফুলিয়ে তেম্‌নি চোখ বুঁজে রইল। ঝম্‌রু আজ ওর উপর অভিমান করে চলে গেছে।

ডোমেরা যখন অনুর কাছে থেকে ঝম্‌রুর দেহটা ছিনিয়ে নিলে ও তখন সেইখানে নেতিয়ে পড়লো।

কতক্ষণ কি ভাবে কেটেছে অনু কিচ্ছু জানে না—চোখ মেলে চাইতেই ওর চোখে পড়ল মা'কে—শিওরে

বসে সস্নেহে ওর কপালে হাত বুলোচ্ছেন। অনু স্থির দৃষ্টিতে ওর মার মুখের পানে চেয়ে রইল। ওর মুখখানা ধীরে ধীরে ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে এল; দু' চোখের কোণে মুক্তোর মত দু' ফোঁটা অশ্রু টল্ মল্ করে উঠ্‌ল।

মা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে, আঁচলে ওর চোখ মুছিয়ে দিতে গেলেন—ও তাঁর হাত খানা ঠেলে দিয়ে বল্‌লে—"যাও"—এর বেশী আর বল্‌তে পার্‌লে না। দু' গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়লো। বালিসে মুখ গুঁজে ও শুধু ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

মা, বাবা, দিদি, ছোড়দি সবাই ওর চার দিকে ব'সে—কারও মুখে কথা নেই। মা ওর হাতখানা নিজের বুকে চেপে ধরে কি বল্‌তে চাইলেন; কাকাবাবু বাধা দিয়ে বল্‌লেন—"থাক, ওকে আর কিছু বোলো না। ওর কচি বুকে যে আজ কি লেগেছে তা' তোমরা জানোনা—জানে তারাই, যারা ওর বুক থেকে ঝম্‌রুকে ছিনিয়ে নিয়েছে!

মার দু' চোখ ছাপিয়ে জল এল—কিন্তু কা'র জন্যে?